দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

শ্রীরামচন্দ্র ও বঙ্গ সংস্কৃতি
পৃঃ— ২৬

শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ শুধু
উত্তর ভারতের নয়,
বঙ্গভূমিরও— পৃঃ ১৩

৭৬ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা।। ৮ জানুয়ারি, ২০২৪।। ২২ পৌষ, ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

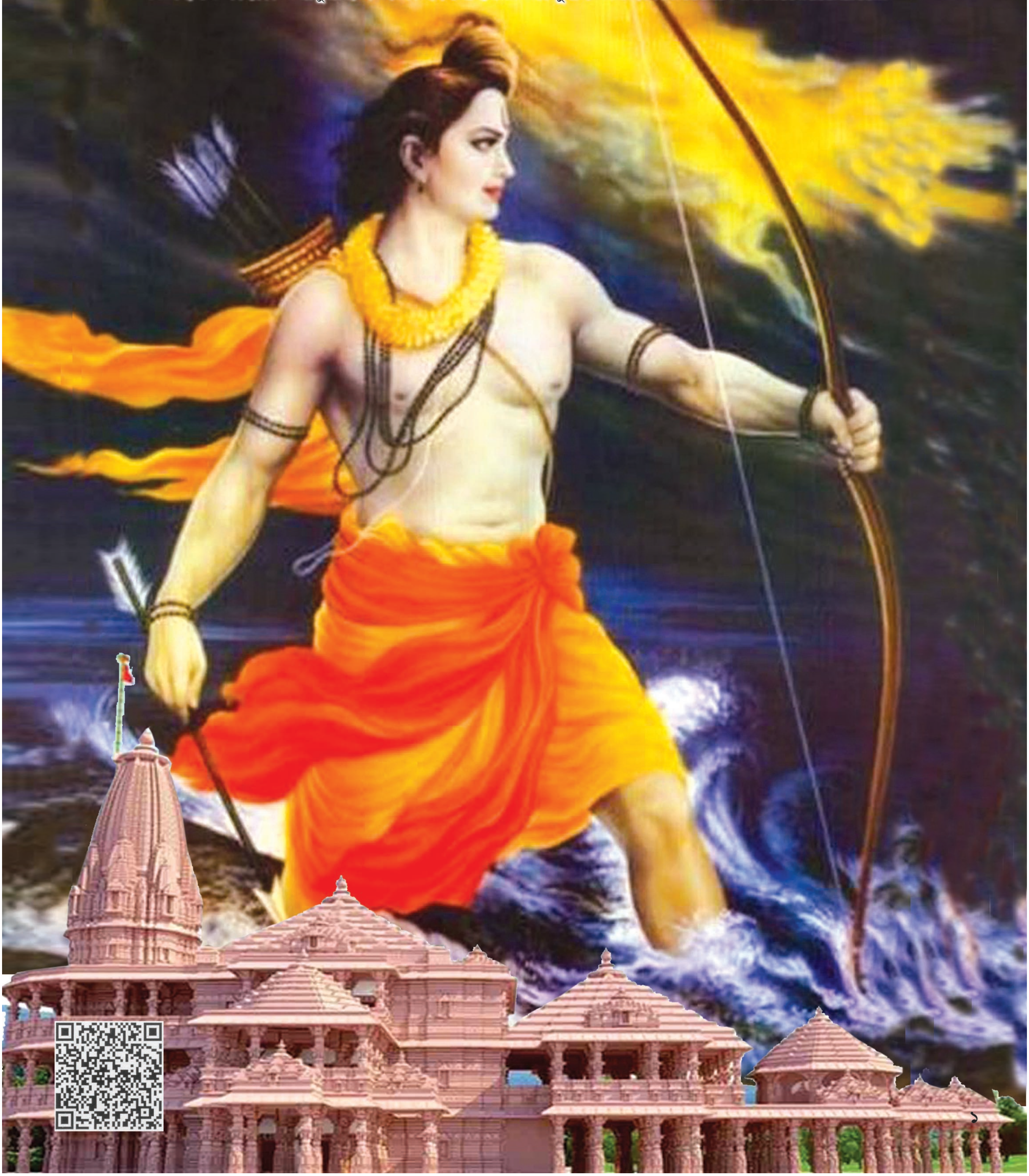

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555

E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ১৬ সংখ্যা, ২২ পৌষ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

৮ জানুয়ারি - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

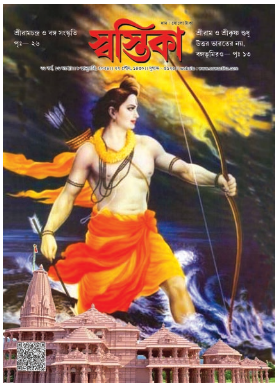

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

‘কাক নিমফল খায় না আর হাঁসেরা শ্মশানে থাকে না’ পরিবারেই মমতার রাজীবতন্ত্র ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

দিদির তো দলেও ‘গদ্দার’ ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

রামমন্দির প্রাঙ্গণে নিহঙ্গ শিখদের লঙ্গর সেবা
◻ চন্দ্রশেখর ধরণী ◻ ৮

ভারতীয় দণ্ডসংহিতা ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে মুক্ত করে বিচারদান ত্বরান্বিত করবে ◻ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ◻ ১০

শ্রীরামমন্দির উদ্বোধনেও এত অস্বস্তি কেন বিরোধীদের?
◻ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ◻ ১১

শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ শুধু উত্তর ভারতের নয়, বঙ্গভূমিরও
◻ ড. শ্যামল পাল ◻ ১৩

অর্থাগমে তীর্থ পর্যটনের বিরাট ভূমিকা রয়েছে
◻ দুর্গাপদ ঘোষ ◻ ১৫

শ্রীরামচন্দ্রকে কীভাবে দেখতেন শ্রীরামকৃষ্ণ, পার্ষদ ও শিষ্যরা
◻ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ২৩

শ্রীরামচন্দ্র ও বঙ্গ-সংস্কৃতি ◻ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস ◻ ২৬

মালদাবাসীর মনের মণিকোঠায় রয়েছেন সাধক বঙ্কটবাবা
◻ প্রবীর কুমার রায় ◻ ৩১

স্বাধীনতার লড়াই এবং স্বামী বিবেকানন্দ
◻ ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি ◻ ৩৩

রামমন্দিরের পুনর্নির্মাণ ভারতীয় ইতিহাসকে কমিউনিস্ট ঐতিহাসিকদের দুষ্টচক্র থেকে উদ্ধারের পথ খুলে দিয়েছে
◻ পিন্টু সান্যাল ◻ ৩৫

শ্রীরামমন্দির : একটি কালোত্তীর্ণ সৌধনির্মাণ প্রকল্প
◻ অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় ◻ ৪৩

ভব্য মন্দিরে শ্রীরামলালা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছেন
◻ ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ ◻ ৪৬

ধর্মের চরম লক্ষ্য মুক্তি; স্বামী বিবেকানন্দই সে পথ দেখিয়েছেন
◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ৪৭

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ◻ রঙ্গম : ৩৮ ◻ অন্যরকম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৯-৫০

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে ১৫ জানুয়ারি, ২০২৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৫ জানুয়ারি, ২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

‘কর্তব্যবোধ দিবস’

শিক্ষক সমাজ জাতির মেরুদণ্ড। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে শিক্ষক ও শিক্ষার সঙ্গে অধিকার ও কর্তব্যবোধের সমন্বয় দেখা যায়নি। একটি রাষ্ট্রবাদী শিক্ষক সংগঠন স্বামীজীর জন্মদিন থেকে নেতাজীর জন্মদিন পর্যন্ত— যে কোনো একদিন কর্তব্যবোধ দিবস হিসেবে পালন করে শিক্ষক সমাজের কাছে কর্তব্যবোধের বার্তা দিয়ে চলেছে।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়েই আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name : **INDIAN OVERSEAS BANK**

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693

IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

‘যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ’

রামময় ভারতবর্ষ । এই দেশের আকাশে-বাতাসে, এই দেশের মানুষের শ্বাসে-প্রশ্বাসে শ্রীরামনাম। রামের নামেই এই দেশের মানুষ যে কোনো কার্যের শুভারম্ভ করিয়া থাকেন। প্রাণবায়ু নির্গত হইবার সময়ও মানুষের কর্ণকুহরে রামনামই শোনানো হইয়া থাকে। শ্মশানযাত্রীরাও রামনাম করিতে করিতেই মৃতের পার্থিব শরীর ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। তিনি ভারতবর্ষের মর্যাদাপুরুষোত্তম। এহেন আরাধ্যপুরুষের জন্মস্থানের উপর নির্মিত মন্দির বিদেশি আক্রমণকারী বাবর ধ্বংস করিয়া তৎস্থলে বাবরি সৌধ নির্মাণ করিয়া ভারতভূমি হইতে রামনাম অবলুপ্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। রামভক্তরা এই অপমান সহ্য করিতে পারেন নাই। মন্দির উদ্ধারকল্পে পাঁচশত বৎসর ধরিয়া ধারাবহিক সংগ্রাম চলিয়াছে। লক্ষ লক্ষ রামভক্ত প্রাণ বলিদান দিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, দেশ স্বাধীন হইবার পরও হিন্দুরা শ্রীরামজন্মভূমির অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। স্বাধীন ভারতেও সেই মন্দিরের দাবিতে আন্দোলন করিতে হইয়াছে। সেই আন্দোলনে সমগ্র দেশের সহিত এই বঙ্গভূমিও সমানভাবে সহভাগী হইয়াছে। স্বাধীন ভারতেই শ্রীরামজন্মভূমি পুনরুদ্ধার আন্দোলনে বঙ্গভূমির দুই সন্তানকে প্রাণ বলিদানও করিতে হইয়াছে। ওই আন্দোলনে সমগ্র দেশের সহিত বঙ্গভূমিও উত্তাল হইয়া উঠিয়াছিল। জনজাগরণের নিমিত্ত সমগ্র দেশের সহিত পশ্চিমবঙ্গেও শ্রীরামজানকী রথযাত্রা, শ্রীরামজ্যোতি রথ, শ্রীরামপাদুকা পূজা, শ্রীরামশিলা পূজা ইত্যাদি বহুবিধ আন্দোলনে বাঙ্গালি চরম উৎসাহে সহভাগী হইয়াছিল। শ্রীরামভক্তিতে উদ্বেল বাঙ্গালিকে দেখিয়া রামবিরোধী রাজনৈতিক দল এবং তাহাদের পোষিত বুদ্ধিজীবীরা প্রমাদ গনিয়াছিল। বাঙ্গালি মানসে ভ্রম উৎপাদনের জন্য তাহারা ‘রাম বঙ্গসংস্কৃতির নহে, উত্তর ভারতের’ বলিয়া বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস করিয়াছে। কিন্তু শত প্রচেষ্টায়ও তাহারা বাঙ্গালি মানসে দ্বিধা সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। বরং রামভক্তির প্রাবল্য ঘটিয়াছে। শ্রীরামশিলা পূজা সংঘটিত হইবার কালে তৎকালীন কমিউনিস্ট মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত প্রকারের প্রশাসনিক প্রতিরোধ সৃষ্টি করিয়াও সফল হইতে পারেন নাই। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ গ্রাম ও শহর হইতে পূজিত রামশিলা অযোধ্যায় প্রেরণ করা হইয়াছে। দীর্ঘ সংগ্রাম, আন্দোলন, বিরোধিতা ও আইনি লড়াইয়ে অবশেষে শ্রীরামজন্মভূমি পুনরুদ্ধার হইয়াছে। অযোধ্যায় নির্মীয়মাণ মন্দিরে আগামী ২২ জানুয়ারি শ্রীরামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইতে চলিয়াছে। সেই মহতী অনুষ্ঠানে শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের পক্ষ হইতে দেশবাসীকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে শামিল হইবার নিমন্ত্রণ চলিতেছে দেশের প্রতিটি শহর ও গ্রামের প্রতিটি পারিবারে। ইহাতেও জনমানসে স্বতস্ফূর্ত আনন্দের বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হইতেছে। আবারও প্রমাণ হইল, দীর্ঘ প্রচেষ্টায় রামবিরোধীরা বঙ্গজীবন হইতে কোনোভাবেই রামভক্তির প্রাবল্য হ্রাস করিতে পারেন নাই।

আসল কথা হইল, পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, অধুনা রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল হইল শতভাগ হিন্দুধর্ম বিরোধী। ইহার একটি কারণ হইল তাহারা ভোটভিখারি। সংখ্যালঘু ভোটের জন্যই তাহাদের হিন্দুবিরোধী হইতে হইয়াছে। ইহারা ইসিহাস বিমুখও বটে। ভারতবর্ষ তথা বঙ্গসংস্কৃতি সম্পর্কে তাহারা একেবারে অজ্ঞ। ‘শ্রীরাম বাঙ্গালির নহে, উত্তর ভারতের’ তাহাদের এই মন্তব্যই ইহার বড়ো প্রমাণ। বাল্মীকি রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডের দশম সর্গে উল্লেখ রহিয়াছে, এই বঙ্গদেশও একদা কোশলরাজ দশরথের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। বঙ্গের সাহিত্য, নাটক, পালাগান, কথকথা ও কীর্তনে রামকথার ছড়াছড়ি। রবীন্দ্রনাথ, স্বামীজী প্রমুখের লেখায় রহিয়াছে শ্রীরামমাহাত্ম্য। বঙ্গজীবনে শ্রীরামের প্রভাব কতটা তাহার আর একটি প্রমাণ হইল, শুধু এই পশ্চিমবঙ্গেই সাড়ে তিনশত হইতে পাঁচশত বৎসরের অধিক ৩৬টি প্রাচীন রামমন্দির রহিয়াছে। আরও বহু প্রাচীন মন্দিরগাত্রে রামায়ণের চিত্র উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এই বঙ্গভূমিতে কতশত মানুষের নাম এবং গ্রাম ও শহর রামের নামে রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এমনকী রামবিরোধীদের নামও রামের নামে রহিয়াছে। তাই রামবিরোধীরা যতই চেষ্টা করুন না কেন, বঙ্গমানস হইতে তাহারা শ্রীরামকে উৎপাটিত করিতে পারিবেন না। অযোধ্যায় নবনির্মিত মন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের পক্ষ হইতে ভারতের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছে। দুঃখের বিষয় হইল তাহারা সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ইতিহাসের অজ্ঞতা অথবা ভোটব্যাংকের লোভে যাহারা এতকাল রামবিরোধিতাই শুধু নহে, শ্রীরামের অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়াছেন এবং অদ্যাবধি করিয়া চলিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে ইহা ব্যতীত পথ নাই। আজ ভূভারত অবগত যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর শ্রীরামনাম কর্ণগোচর হইলেই রাবণের ন্যায় অগ্নিশর্মা হইয়া ওঠেন। ইহারা হিন্দুধর্মদ্বেষী। ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে যাইয়া হিরণ্যকশিপু-রাবণ-কংস,তাড়কা-পুতনা সকলের ধ্বংস হইয়াছে। ইহাদেরও ধ্বংসের দিন সমাগত। ইহাদের শত বিরোধিতা ও চক্রান্ত সত্ত্বেও এই দেশের মানুষ ধর্মের পক্ষেই রহিয়াছেন ও থাকিবেন। কেননা ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণী হইল, যতো ধর্মোস্তত জয়ঃ।

সুভাষিতম্

অবিশ্রামং বহেদ্ভারং শীতোষ্ণং চ ন বিন্দতি।

সসন্তোষস্তথা নিত্যং ত্রীণি শিক্ষেত গর্দভাৎ ।

অবিশ্রাম ভারবহন, শীত-গ্রীষ্ম গ্রাহ্য না করা এবং সদা সন্তুষ্ট থাকা— এই তিনটি গুণ গাধার থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

‘কাক নিমফল খায় না আর হাঁসেরা শ্মশানে থাকে না’

পরিবারেই মমতার রাজীবতন্ত্র

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

বিজেপি আর তৃণমূলের বিরুদ্ধে ‘সাফ যাত্রা’ করছে বিদেশি বামেরা। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে তা ‘শব যাত্রা’-য় পরিণত হলে আমলাতন্ত্রের প্রতীক। কেন? পরে আসছি সে কথায়।

২০২৪-এর লোকসভা ভোটের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে রাজীবতন্ত্র দিয়ে ঘিরেছেন। ভাইপো অভিষেককেও রেখেছেন সেই তন্ত্রের বাইরে। পঞ্চাশের দশক থেকে সত্তরের দশক ধরে নেহরু-গান্ধী পরিবারের কাছে বন্ধক জাতীয় কংগ্রেস। কংগ্রেসের আঁতুড় ঘরে পালিত মমতা। দলীয় বা প্রশাসনিক গণতন্ত্র তিনি মানেন না। পরিবারতন্ত্রকে মানেন। জাতীয় কংগ্রেসের মডেলে মমতার পরিবার চালান আমলারা। আচার্য চাণক্য আমলাদের গোরু বলতেন। তারা গণ্ডির বাইরে যান না।

মমতা প্রশাসনে দলের কেউ নাক গলাতে পারেন না। কংগ্রেস নেতা, পরবর্তীতে ত্রয়োদশ রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় চল্লিশ বছর ধরে তাই লিখেছেন ব্যক্তিগত ডাইরিতে। দেখিয়েছেন একটি পরিবার কীভাবে দল আর দেশকে ধ্বংস করে দিয়েছে। যার প্রধান হোতা ইন্দিরা গান্ধী। পদের লোভে পড়ে প্রণববাবু তখন প্রতিবাদ করতে পারেননি। মমতা সেই কংগ্রেসের ছায়া। মমতার প্রশাসন-পরিবারে আমলারাই প্রধান। তার কাছে আমলারা প্রেয় আর বাকিরা শ্রেয়। নেহরু, ইন্দিরা আর রাজীব গান্ধী আমলাতে বিশ্বাস রেখে দল আর দেশ চালাতেন। মমতাও তাই করেন। আর সেই কারণে দলে আর ইন্ডিজোটে গোল বেঁধেছে। জানিয়েছেন রাজ্যে একা লড়বেন। কংগ্রেস বা বামে তাঁর বিশ্বাস নেই। শোনা যাচ্ছে লোকসভা ভোটের পর রাজ্য কংগ্রেসে বর্তমান সভাপতি অধীর চৌধুরীর পতন হবে।

মমতার চিরশত্রু দীপা দাসমুন্সির উত্থান ঘটবে। রাজীব নামের ওপর মমতার চির আকর্ষণ। রাজীব গান্ধী, রাজীব সিনহা, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় আর এখন আবার রাজীব কুমার। প্রথম রাজীব তাঁর রাজনৈতিক গুরু। বাকিদের তিনি গুরু। তাঁর তাঁবেদার। নজিরবিহীন ধরনাতে বসে পুলিশ কর্তা রাজীব কুমারকে সিবিআই পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন মমতা। তাঁকেই পুলিশের সর্বময় কর্তা বানিয়েছেন মমতা। ভাবুন কাণ্ড! শেষ রক্ষা হবে কিনা কিছুদিনেই জানা যাবে। রক্তাক্ত পঞ্চায়েত ভোট জিতেছিলেন রাজীব সিনহাকে ব্যবহার করে। এজন্য রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বসুকে ভুলও বুঝিয়েছিলেন।

> নজিরবিহীন ধরনাতে বসে পুলিশ কর্তা রাজীব কুমারকে সিবিআই পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন মমতা। তাঁকেই পুলিশের সর্বময় কর্তা বানিয়েছেন মমতা। শেষ রক্ষা হয় কি না সেটাই দেখার।

রাজ্যপাল দপ্তরে এক বিতর্কিত মহিলা আমলাকে ঢুকিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি গুপ্তচর বৃত্তি করাতেন। তিনি এখন স্বরাষ্ট্র সচিব হয়েছেন। ক্রন্দনরত দলছুট রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে জোর করেই ফিরিয়ে ছিলেন মমতা। রাজীব সিনহা আপাতত অদৃশ্য। আমলাদের ‘ষটচক্র’ নিয়ে এই রাজ্য চালান মমতা। কিছু ক্ষেত্রে তাঁকে ছুঁচো গিলতে হয়েছে। তবুও মমতা আমলাদাসী। ‘ষটচক্র’ সায় না দিলে দলের বা মন্ত্রীসভার কোনো সদস্যের কথায় সায় দেন না মমতা। বছরে ছয় থেকে সাতবার আমলা পালটান তিনি। মমতার প্রশাসনিক-পারিবারিক দলে তিনি আর তাঁর আমলারাই সদস্য। বাকিরা আশ্রিত। শুনেছি তাদের কথায় ইন্ডি জোটের সর্বনাশ হেঁকেছেন মমতা।

তিনি বিজেপির সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই চান। বিদেশি বাম আর কংগ্রেসের মতো খুচরো পাপ রাখতে নারাজ। এ রাজ্যে মল্লিকার্জুন খাড়্গের বোঝা টানতে রাজি নন মমতা। তিন রাজ্যে গেরুয়া ঝড় যেভাবে কংগ্রেসকে গিলে ফেলেছে তাতেই প্রমাদ গুনেছেন মমতা। আবার লিখছি, বিজেপি এ রাজ্যের ভবিতব্য। তাই হাঁস আর কাকেরা মমতার ‘শ্মশান বাংলায়’ থাকবে না। নিমফলও খাবে না। হাঁসে-কাকে মিলে বিদেশি বামেদের ডুবিয়েছিল। মমতার ষটচক্রও তাঁকে ডোবাবে। যে আমলা রোগ তাকে ধরেছে তা যে বিজেপির থেকেও মারাত্মক আর বড়ো শত্রু, অচিরেই মমতা তা বুঝবেন। মূর্খরা কেবল মূর্খদের ভাষা বোঝে। শুধু মমতা তা বুঝেও কিন্তু তা বোঝেন না। মমতার পতন অবশ্যম্ভাবী। রাজ্য বিজেপি মমতার এই ভুল অঙ্ক যত শীঘ্র ধরতে পারে তত তাদের রাজনৈতিক ফায়দা। □

দিদির তো দলেও ‘গদ্দার’

ঘেটে ঘয়েষু দিদি,

আমি আগে থাকতেই ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলাম আপনাকে। কিন্তু কাজে লাগল না। একে নতুন বছরের প্রথম দিন, তাতে আবার টানা তিন দফা ক্ষমতায় থাকা দলের প্রতিষ্ঠাদিবস। কিন্তু পয়লা জানুয়ারি আপনাকে যে ভাবে অসুস্থ শরীর নিয়েও গোটা দিন দলীয় কোন্দল দেখতে হলো তাতে মনে হয় আপনি ভালো নেই। সন্ধ্যায় ভাইপোকে নিয়ে বৈঠক করেছেন শুনলাম কিন্তু আমি জানি কোনও সুরাহা হয়নি। আপনাকে নামিয়ে সিংহাসন দখল করতে মরিয়া ভাইপো সহজে ছাড়বে না। আপনাকে ‘ব্ল্যাক মেল’ করা চলবে। সব মিলিয়ে যা দেখছি তাতে আপনার দলের মতো আপনিও এখন ‘ঘেটে ঘ’।

দল ছাড়ার জন্য বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে আপনি ‘গদ্দার’ বলেন। কিন্তু দিদি দলে থেকেও পয়লা জানুয়ারি যা যা হলো তাও কি গদ্দারি নয়! অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর বক্তব্যের ‘বাক্যগঠন’ নিয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ। সেখানেই না-থেমে তিনি দলের মন্ত্রীদের একাংশকেও নিশানা করেন। নাম না-করে কুণাল ওই মন্ত্রীদের সম্পর্কে সটান বলেন যে, তাঁরা শুভেন্দু অধিকারীর বিষয়ে ‘নরম’। কুণালের আরও দাবি, তাঁর মতো কয়েক জনই কেবল শুভেন্দুকে তাঁর ভাষায় জবাব দিচ্ছেন। এটা সত্যি হলেও প্রকাশ্যে বলা কি ঠিক? আসলে দল যে শুভেন্দু তথা বিজেপিকে ভয় পাচ্ছে সেটাই তো জেল খাটা কুণাল বলে দিয়েছেন। ইনি সেই কুণাল যিনি মনে করেন রাজ্যে বিভিন্ন চিটফান্ড সংক্রান্ত দুর্নীতিতে দিদি আপনি সবচেয়ে বড়ো ‘সুবিধাভোগী’। হ্যাঁ দিদি, মনে পড়ছে নিশ্চয়ই কুণালের সেই ‘চিৎকার’। যা ভ্যান বাজিয়েও চাপা দিতে পারেনি পুলিশ।

দিদি, তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন কর্মসূচি প্রতিবারই হয়। বেলা গড়াতে না গড়াতে শুরু হয়ে যায় মন্তব্য এবং পালটা মন্তব্যের ঠোকাঠুকি। প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চ যেন কুস্তির আখড়া!

এমনিতেই ভাইপো কয়েক দিন ধরে চাপ সৃষ্টি করেছেন আপনার উপরে। প্রচারে যাবে না, নিজের কেন্দ্রেই থাকবে, এসব নেতাদের মুখ দিয়ে বলে চলেছেন। যা আমার একেবারেই নাপসন্দ। আপনার অনুগত ভাই হিসেবে। কিন্তু দিদি কেউ তার প্রতিবাদ করেনি। এঁরা কি ‘গদ্দার’ নন? কুণাল তো বটেই আপনার মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, পার্থ ভৌমিক, বিধায়ক তাপস রায়েরা তাতে মদত দিয়েছেন।

এর পরেই মনে আপনার পরামর্শেই সাধারণত নীরব থাকা বক্সিদা বলেছিলেন, ‘উনি লড়াইয়ের ময়দান থেকে পিছিয়ে যাবেন না। যদি লড়াই করেন, তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে লড়াই করবেন উনি।’ তার পরেই পালটা কুণাল বলেন, ‘অভিষেক লড়াইয়ের ময়দানেই রয়েছেন। আর তিনি যে কথা বলতে চান, তা শুনলে দলেরই মঙ্গল।’ নন্দীগ্রামে আপনার লজ্জাজনক পরাজয়ের দায়ও প্রকারান্তরে দলের রাজ্য সভাপতি বক্সীর উপর দেন কুণাল। নৈহাটিতে অর্জুন সিংহ-সোমনাথ শ্যামের দ্বন্দ্ব মেটাতে না-পারার দায় তো একেবারে নাম করেই চাপিয়েছেন বক্সীর উপরে।

এর পরেই নজরে আসে প্রতিষ্ঠা দিবসের একটি মঞ্চ থেকে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য। তিনি বলেন, ‘যাঁরা পার্টিতে নতুন এসেছেন, অভিষেকের নেতৃত্বে যাঁরা পার্টিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, তাঁদের দলের ইতিহাস জানতে হবে! অনেক লড়াই-আন্দোলন করে দল ক্ষমতায় এসেছে। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই আন্দোলন করেছেন।’ আরও বলেন, ‘দলে অনেকেই বলছেন নবীন-প্রবীণের বিতর্ক রয়েছে। যুবদের মাথার উপরেও রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার আমরা যারা প্রবীণ, তাদের মাথার উপরেও রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই।’

মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ বলেন ‘চাকরি চুরি’র প্রসঙ্গও। তিনি বলেন, ‘আমি স্বীকার করছি, দলের একাংশ দুর্নীতি করেছে। তাদের কেউ কেউ দলের সঙ্গে এখনও যুক্ত রয়েছে। কিন্তু তা বলে তাদের জন্য গোটা দলকে দুর্নীতিতে যুক্ত করা উচিত নয়।’ এরপরে আবার কুণাল। বলেন, ‘আমি যখন পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছিলাম, তখন এই ববিদা বলেছিলেন, কুণাল মন্ত্রীসভার কেউ নয়। যা হয়েছে, তা মন্ত্রীসভার সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। আমি তো এই আওয়াজটাই তুলতে চেয়েছিলাম! যখন এসব হয়েছিল, তখন (ফিরহাদ) কোথায় ছিলেন। করার সময় আটকাননি কেন?’

এরই মধ্যে, অন্য একটি মঞ্চ থেকে প্রবীণ সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলে বসেছেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না থাকলে তৃণমূল সারা দেশের রাজনীতিতে ছাগলের তৃতীয় বাচ্চায় পরিণত হতো।’ আবার কুণাল বলেন, ‘সুদীপদা তো দিল্লিতে দেখলেন, মমতাদির আশীর্বাদ নিয়ে দিল্লিতে অভিষেক যে আন্দোলন করেছিলেন, তাঁর ঝাঁজ কেমন! ছাগলের তৃতীয় সন্তান হয়ে যাবে, এটা ওঁর বলা সাজে না। এই কথা বলার অর্থ কী? অন্ধ আনুগত্য থেকে এসব বলছেন। সুদীপদা সামনে থাকলে সামনে বসে ভাব সম্প্রসারণ করে বুঝিয়ে দিতাম!’

দিদি, আপনি জানেন তবুও একটা কথা বলে রাখি, কুণাল যা বলছেন তা কিন্তু আসলে আপনার আদরের ভাইপোর কথা। কুণাল এখন দলের নয়, ভাইপোর মুখপাত্র। আর আসলে ভাইপো আপনাকে ‘ঘেটে ঘ’ করে দিচ্ছেন। ভোটের আগে বড্ড চিন্তা হচ্ছে দিদি!

কুণাল যা বলছেন তা কিন্তু আসলে আপনার আদরের ভাইপোর কথা। কুণাল এখন দলের নয়, ভাইপোর মুখপাত্র।

অতিথি কলম

চন্দ্রশেখর ধরণী

রামমন্দির প্রাঙ্গণে নিহঙ্গ শিখদের লঙ্গর সেবা

আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় নবনির্মিত ভব্য মন্দিরে রামলালা বিরাজ করবেন। এই মহাতী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নিহঙ্গ শিখদের পক্ষে চালু থাকবে লঙ্গর পরিষেবা। ১৮৫৮ সালে মুসলমানদের কবল থেকে শ্রীরামজন্মভূমি উদ্ধার সংগ্রামের নেতৃত্বদানকারী নিহঙ্গ বাবা ফকির সিংহ খালসার বংশধর বাবা হরজিৎ সিংহ রসুলপুর এই ঘোষণা করেছেন।

অযোধ্যার শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলনের ইতিহাসে ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর দিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ঐতিহাসিক দিনটিতে সনাতন ধর্মের সেনানী নিহঙ্গ বাবা ফকির সিংহ খালসার নেতৃত্বে শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত ২৫ জন সিংহ-হৃদয় নিহঙ্গ বিতর্কিত সৌধটিকে দখলমুক্ত করেন। সেখানে প্রবেশ করে তাঁরা যজ্ঞ করেছিলেন এবং প্রতিটি দেওয়ালে 'রাম-রাম' লিখে দিয়েছিলেন। শ্রীরামজন্মভূমিকে জেহাদি-সন্ত্রাসমুক্ত করে তাঁরা গৈরিক ধ্বজ উত্তোলন করেছিলেন। আজ সেই নিহঙ্গ বাবা ফকির সিংহ খালসার উত্তরসূরি, তাঁর অষ্টম বংশধর— বাবা হরজিৎ সিংহ রসুলপুর নবনির্মিত ভব্য রামমন্দিরে আগামী ২২ জানুয়ারি রামলালার বিগ্রহ স্থাপন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে অযোধ্যায় ২ মাস ধরে লঙ্গর পরিষেবার সূচনা করতে চলেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, 'আমরা সবাই সনাতন ধর্মের অংশ। আমাদের ধর্ম হলো— সনাতন'।

সনাতন পরম্পরার ধারক ও বাহক শিখ সম্প্রদায় : খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দ্বারা শিখ ও হিন্দু সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে বাবা হরজিৎ সিংহ রসুলপুর জোর দিয়ে জানান যে শিখ ও সনাতন এক ও অভিন্ন। আমাদের দেশ আলাদা নয়। আমাদের দেশ হলো ভারত। কট্টরপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী যারা শিখ পন্থাকে হিন্দুধর্মের থেকে পৃথক প্রমাণে ব্যস্ত, তাদের জানা উচিত যে শ্রীরামজন্মভূমি মুক্তি সংগ্রামে অংশ নেওয়ার জন্য প্রথম এফআইআর শিখেদের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছিল। শিখ পন্থা সনাতন হিন্দু সংস্কৃতির একটি অভিন্ন অঙ্গ। শিখ সম্প্রদায় হলো ধর্মরক্ষক যোদ্ধাস্বরূপ। সনাতন ধর্মের ধারক ও বাহক রূপে নিজেদের পরিচয় দিয়ে তিনি বলেন যে তাঁর পূর্বপুরুষরা সনাতন ধর্ম রক্ষায় প্রাণবলিদান করেছিলেন। তাঁর পূর্বসূরিদের মতো তিনিও ভগবান শ্রীরামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ভগবানের প্রতি তাঁর হৃদয় অগাধ আস্থায় পরিপূর্ণ। অযোধ্যায় আগত তীর্থযাত্রী, দর্শনার্থী-সহ আপামর জনসাধারণের স্বার্থে লঙ্গর পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের মহান পরম্পরা রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি বলেন, 'শিখ ও হিন্দু ভাইয়েরা এই আনন্দযজ্ঞে একত্রে যোগদান করবে। সবাইকে এটাই বলার চেষ্টা করছি যে আমরা সবাই সবার পাশে আছি'।

১৮৫৮ সালের নভেম্বরে নিহঙ্গ বাবা ফকির সিংহের নেতৃত্বে ২৫ জন বীর যোদ্ধা শ্রীরামজন্মভূমির ওপরে নির্মিত বাবরি ধাঁচা নামক বিতর্কিত সৌধের দখল নিতেই বিতর্কিত বাবরি মসজিদের তদানীন্তন মোয়াজ্জেমের তরফে দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে অয়োধ থানার পুলিশ আধিকারিক সেই সিংহ-হৃদয় নিহঙ্গ যোদ্ধার বিরুদ্ধে এফআইআর রুজু করেন। সেদিনে সংঘটিত সেই মুক্তি সংগ্রাম এক ঐতিহাসিক ঘটনা হলেও, ২০১৯ সালের ৯ নভেম্বরে হিন্দুদের পক্ষে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে শ্রীরামজন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণের নির্দেশপর্বে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য ও প্রমাণ হিসেবে সেই বিশেষ ঘটনাটির উল্লেখ অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। এই কারণে আগামী ২২ জানুয়ারি নবনির্মিত ভব্য মন্দিরে যখন রামলালার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হতে চলেছে, তখন শিখ সম্প্রদায় সেই প্রক্রিয়া থেকে কীভাবে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে? সেই মহতী কার্যক্রমে শামিল হওয়ার অভিপ্রায়ে তিনি নিহঙ্গ ভ্রাতৃসঙ্ঘের সহকর্মী-সহযোদ্ধাদের সঙ্গী করে দেশ-বিদেশ হতে আগত পুণ্যার্থী-দর্শনার্থীদের সেবাদানের উদ্দেশ্যে লঙ্গর স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। শিখ ও সনাতন বিচারধারার মেলবন্ধনের প্রয়াসরত নিহঙ্গ বাবা হরজিৎ সিংহ রসুলপুর বার বার নানা সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। এই সব বিষ অমৃতজ্ঞানে গলাধঃকরণ করে চলা হরজিৎজীর গলায় শোভিত রুদ্রাক্ষের মালা। নিহঙ্গ সম্প্রদায়ের প্রধান (জথেদার) বাবা হরজিৎ সিংহ বলেন যে, দেশ ও ধর্মের ক্ষেত্রে যখনই প্রয়োজন পড়বে, তিনি ও তাঁর পরিবার তা মোকাবিলায় কখনোই পিছিয়ে আসবেন না।

শিখ সম্প্রদায় কর্তৃক সংগ্রামের সাক্ষ্য বহন করছে ব্রহ্মকুণ্ড সাহিব : জীবনে চলার পথে নানা বিষয়ে অনেকেই ক্ষমতা, শক্তি ও প্রভুত্ব জাহির করে থাকে। বৃহত্তর সমাজের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি আজ একটি মানসিকতায় পর্যবসিত হলেও, ভারতের অতীত ইতিহাসে এমন একাধিক মুহূর্ত বিদ্যমান যখন ভারতীয়রা ত্যাগ ও বলিদানের মাধ্যমে এই ক্ষমতা, শক্তি ও সাহসের দ্বারা জনমানসে প্রভাব বিস্তার করা ভ্রান্ত চিন্তাধারাকে পরাজিত করে সব ধরনের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করেছেন। শ্রীরামজন্মভূমিতে নির্মিত ভব্য রামমন্দির তারই প্রমাণ। ইসলামি শাসনে ক্ষমতার প্রদর্শন, তাদের সেনা শক্তির প্রবল প্রতাপ ও রাজনৈতিক প্রভুত্বের বেড়াজাল ভেদ করে শ্রীরামজন্মভূমি মুক্তির লক্ষ্যে মরণপণ সংগ্রামের অন্তর্গত অসংখ্য সংঘর্ষ ছিল স্বাধীনতার যুদ্ধ। নিহঙ্গ শিখ সম্প্রদায়ের একটি গোষ্ঠীর প্রধান এরকমই একটি সম্মুখ সমরে নেতৃত্বদান করেন। ১৬৭২ সালে গুরু গোবিন্দ সিংহের অযোধ্যায় পদার্পণের প্রমাণ বহন করছে ব্রহ্মকুণ্ড সাহিব। এরপরে সরযূ দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে এবং এই নিরন্তর সংগ্রামে সনাতন ধর্মরক্ষাকারীদের বলিদানে

সরযূ নদীর জল অগণিত বার রক্তে লাল হয়ে গেছে। মুঘল বাদশা ঔরঙ্গজেব শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির ধ্বংসের উদ্দেশ্যে অযোধ্যা আক্রমণ করলে, সাধু-সন্তদের সঙ্গে নিহঙ্গসেনা মুঘলদের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে, ফলে মুঘল সেনা সাময়িকভাবে পরাস্ত হয়। সেই লড়াইয়ের পর নিহঙ্গ সম্প্রদায়ের যোদ্ধারা পঞ্জাবে ফিরে যান।

ইংরেজ আমলে, ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর অয়োধ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়। সেই অভিযোগপত্রের বিবরণ অনুযায়ী প্রায় ২৫ জন নিহঙ্গ বীর বিতর্কিত সৌধের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে হোম-যজ্ঞ ও পূজা শুরু করেছিল। বিতর্কিত মসজিদের ভিতর তারা জোরপূর্বক চবুতরা স্থাপন করে সেখানে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল। এছাড়াও, কয়লার গুঁড়ো দিয়ে প্রতিটি দেওয়ালে তাঁরা 'রাম-রাম' লিখে দিয়েছেন। স্টেশন হাউজ অফিসারের কাছে এই মামলাটি (সংখ্যা— ৮৮৪) দায়ের করে বিতর্কিত মসজিদের মোয়াজ্জেম সৈয়দ মহম্মদ খতিব। সুপ্রিম কোর্টে শ্রীরামজন্মভূমি মামলার শুনানি চলাকালীন সর্বোচ্চ আদালতে হিন্দুদের তরফে তৎকালীন মোয়াজ্জেমের দায়ের করা নালিশের এই অভিযোগপত্রটিকে একটি প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরা হয়। ওই অভিযোগ মোতাবেক ইংরেজ পুলিশ বলপ্রয়োগ করে শ্রীরামজন্মভূমি প্রাঙ্গণ থেকে নিহঙ্গ বীরদের অপসারণ করে চত্বরটিকে সিল করে। এরপরে মন্দির প্রাঙ্গণটির বিভাজন করা হয়। ঘেরাটোপের বাইরে দাঁড়িয়ে, মসজিদের দিকে মুখ করে হিন্দুরা শ্রীরামজন্মস্থলের পূজার অনুমতি পায়।

বৈরাগী সাধুদের সংগ্রাম : নিহঙ্গ শিখ যোদ্ধাদের এই উল্লেখযোগ্য সংগ্রামের আগে, ১৮৫৫ সালে বৈরাগী সন্ত সম্প্রদায় প্রায় ২২.৮৩ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের রামচবুতরা নির্মাণ করেছিলেন। এই স্থানটিই বর্তমানে হনুমানগঢ়ী নামে পরিচিত। এই চবুতরা নির্মাণের জন্য স্থানীয় মুসলমানদের সঙ্গে বৈরাগীদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় [তথ্যসূত্র : কে.এম. পানিক্কর : অ্যান অ্যানাটমি অব কনফ্রন্টেশন: অযোধ্যা অ্যান্ড দ্য রাইজ অব কম্যুনাল পলিটিক্স ইন ইন্ডিয়া (এ হিস্টোরিকাল ওভারভিউ)]। এর প্রতিশোধে মুসলমানেরা প্রথমে অযোধ্যায় নবাবের দরবারে যায়। কিন্তু নবাবি শাসন সমাপ্ত হওয়ার দরুন তারা শেষে ইংরেজদের স্থাপিত থানা ও আদালতের দ্বারস্থ হয়। ১৮৫৭-র স্বাধীনতা যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই রামচবুতরার মোহন্ত সুদৃঢ়ভাবে এটিকে নির্মাণ করান। শোনা যায়, ১৮৬১ সালে জেলা প্রশাসন বিতর্কিত কাঠামোটিকে চবুতরার থেকে পৃথক করার জন্য একটি প্রাচীর নির্মাণ করে। ১৮৮৩ সালে মোহন্ত রঘুবর দাস চবুতরার ওপরে মন্দির নির্মাণ শুরু করলেন। কিন্তু মুসলমানদের আপত্তিতে ব্রিটিশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই নির্মাণ কাজ স্থগিত করে দেয়। এরপর ১৮৮৫ সালে মোহন্ত রঘুবর দাস ফৈজাবাদের নিম্ন আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। এই মামলায় তিনি আবেদন করেন যে এই চবুতরার মালিক হওয়ার কারণে এখানে তাঁকে মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হোক।

অনেক আগেই হয়তো নির্মিত হতো মন্দির : না ছিল আইনি বাধা, না ছিল অন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা। শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণ অনেক আগেই হয়তো সমাপ্ত হতো। কিন্তু বাধা ছিল অন্য রকমের ভয়ের। বাধা ছিল মতবিরোধ, আপত্তি, অসম্মতির। ছিল উপদ্রব ও সন্ত্রাসের আশঙ্কা। ফৈজাবাদের নিম্ন আদালত মোহন্ত রঘুবর দাসকে মন্দির নির্মাণের অনুমতি দানে অসম্মত হয়। নিম্ন আদালত তার দেওয়া রায়ে বলে যে যদি কোনো স্থানে চবুতরার ওপর মন্দির নির্মাণ করা হয় তবে সেখানে মন্দিরের ঘণ্টা ও শঙ্খধ্বনি হতে থাকবে। এই ক্ষেত্রে যেহেতু হিন্দু-মুসলমান দু'পক্ষই একই রাস্তা দিয়ে চলাচল করে, সেহেতু একদিন অন্য অনেক অপরাধের ঘটনা এখানে ঘটে যাওয়া স্বাভাবিক এবং এর ফলে অসংখ্য লোকের নিহত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। মোহন্ত রঘুবর দাসের দায়ের করা এই মামলার রায়দানের ক্ষেত্রে বিচারকের এই সিদ্ধান্ত ছিল ভিত্তিহীন। এই রায়ের বিরুদ্ধে মোহন্ত রঘুবর দাস এক দীর্ঘ আইনি লড়াই জারি রাখেন। ব্রিটিশ জেলা জজ কর্নেল এফ.ই.এ. কেমির মোহন্ত রঘুবর দাসের আবেদন খারিজ করে দেন। কিন্তু তিনি তার রায়ে উল্লেখ করেন – 'এটা সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক যে হিন্দুরা যে ভূমিকে বিশেষভাবে পবিত্র বলে মানে, সেই স্থানেই নির্মিত হয়েছে একটি মসজিদ! কিন্তু ৩৫৬ বছর আগে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে সেই সমস্যার সমাধানে এই মামলায় এখন অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে।' এইভাবেই হিন্দুদের দাবির যথার্থতার পরোক্ষ স্বীকৃতি এই রায়ে নিহিত ছিল। মোহন্ত রঘুবর দাস না দমে কেমিরের দেওয়া এই রায়ের বিরুদ্ধে অযোধ্যার উচ্চ আদালতে আপিল করলেন। ১৮৮৬ সালের ১ নভেম্বর বিচারক ডব্লু. ইয়ং বলেন যে, হিন্দুরা এই 'পবিত্র স্থানে' একটি 'নতুন মন্দির' নির্মাণ করতে চায়, যে স্থানটিকে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান হিসেবে মানা হয়ে থাকে। তিনি তার রায়ে উল্লেখ করেন, 'মসজিদ সংলগ্ন ময়দানের মধ্যে এই স্থানের অবস্থান যা তৈরির কারণ বাদশা বাবরের নৃশংসতা ও অত্যাচার, যে বাবর হিন্দুদের বিশ্বাস ও আস্থা অনুযায়ী এই পবিত্র স্থানটিকেই সব জেনেবুঝে মসজিদ নির্মাণের জন্য বেছে নিয়েছিল।'

শেষ পর্যন্ত, এই বিবাদের সমাধান আদালতের মাধ্যমে হলো, যখন হিন্দুরা তাদের বক্তব্য উপস্থাপনের লক্ষ্যে মনের মধ্যে প্রোথিত ভয় গ্রন্থিটিকে উপড়ে ফেলতে সক্ষম হলো। ১৯৯২ সালের আগে, ১৯৩৪ সালেও বিতর্কিত ধাঁচা সংবলিত শ্রীরামজন্মভূমি পুনরুদ্ধারের প্রয়াস চালানো হয়েছিল। কিন্তু তখন ব্রিটিশ সরকার ওই বিতর্কিত কাঠামোটিকে মেরামত করে দেয়। কিন্তু তখনও তারা হিন্দুদের থেকে শ্রীরামজন্মভূমি ছিনিয়ে নিতে সফল হয়নি।

(লেখক 'মিডিয়া ওয়েল বিইং অ্যাসোসিয়েশন'-এর চেয়ারম্যান)

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর বীরভূম জেলার মহেশ্বর খণ্ডের বড়গেছিয়া শাখার স্বয়ংসেবক তথা দক্ষিণ নদীয়া জেলা প্রচারক সুশোভন মণ্ডলের ঠাকুমা সরস্বতী মণ্ডল গত ১৩ ডিসেম্বর পরলোকগমণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

উত্তর বীরভূম জেলার মহেশ্বর খণ্ড কার্যবাহ গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়ের পিতৃদেব সত্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় গত ১৬ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনি ১ পুত্র, ১ কন্যা ও ১ নাতি রেখে গেছেন।

ভারতীয় দণ্ডসংহিতা ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে মুক্ত করে বিচারদান ত্বরান্বিত করবে

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

গত ২০ ডিসেম্বর, ২০২৩ লোকসভা নতুন ফৌজদারি আইন অনুমোদন করেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওইদিন তিনটি সংশোধিত ফৌজদারি আইন বিল উত্থাপন করেছেন যা ইন্ডিয়ান পেনাল কোড (আইপিসি) অর্থাৎ ভারতীয় দণ্ডবিধি, ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর কোড (সিআরপিসি) অর্থাৎ ফৌজদারি কার্যবিধি এবং ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট (আইইএ) অর্থাৎ ভারতীয় সাক্ষ্য আইনকে প্রতিস্থাপন করবে। তিনটে নতুন বিলের নাম যথাক্রমে ভারতীয় ন্যায় (দ্বিতীয়) সংহিতা (বিএনএস) অর্থাৎ ভারতীয় সাক্ষ্য আইনকে প্রতিস্থাপন করবে। তিনটে নতুন বিলের নাম যথাক্রমে ভারতীয় ন্যায় (দ্বিতীয়) সংহিতা (বিএনএস), ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা (দ্বিতীয়) সংহিতা (বিএনএসএস) ও ভারতীয় সাক্ষ্য (দ্বিতীয়) (বিএসবি)। তিনটি বিলই ধ্বনি ভোটে পাশ হয়।

শাহ বলেছেন, ব্রিটিশরা রাষ্ট্রদ্রোহ আইন তৈরি করে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কয়েক দশক কারাগারে রাখত। আইনটি বাতিল করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আগের সরকারগুলো আইনের অপব্যবহার করেছে। এখনও তা চালু ছিল। প্রথমবার মোদী সরকার রাষ্ট্রদ্রোহ ধারা ১২৪ সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন যেহেতু আমরা স্বাধীন, যে কেউ এর বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে। সরকারের সমালোচনা করে কেউ জেলে যাবে না। কিন্তু কেউ দেশের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারবে না। সরকার রাজদ্রোহের পরিবর্তে দেশদ্রোহ নিয়ে এসেছে। শব্দগুলো ভারতীয় এবং এর অভিমুখ ভারতীয় স্বার্থরক্ষা।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেছেন যে নতুন বিলগুলোতে 'মব-লিঞ্চিং' জঘন্য অপরাধ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং তার জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান করা হয়েছে। কংগ্রেসের নিন্দা করে শাহ বলেছেন যে বিরোধীরা বিজেপিকে গালি দেওয়ার জন্য 'মব লিঞ্চিং' ব্যবহার করছে, কিন্তু তারা যখন সরকারে ছিল তখন এ বিষয়ে আইন করতে ভুলে গেছে।

ভারতীয় দণ্ডবিধির উদ্দেশ্য ছিল শাস্তি দেওয়া, ন্যায়বিচার নয়। ব্রিটিশ আমলের আইনগুলো বিদেশি শাসনকে রক্ষা করার লক্ষ্যে ছিল। সেখানে নতুন বিলগুলি জনগণকেন্দ্রিক। ভারতীয় ন্যায় (দ্বিতীয়) সংহিতা, ২০২৩ সংসদে পাশ হওয়ার পরে দেশে কার্যকর হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, নতুন ফৌজদারি আইন বিলগুলো সংবিধানের চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং দেশের মানুষের মঙ্গলের কথা মাথায় রেখে আনা হয়েছে। তিনি বলেন, 'মোদীজীর নেতৃত্বে আমি এমন বিল এনেছি যা ভারতীয়তা, ভারতীয় সংবিধান এবং জনগণের মঙ্গলের উপর জোর দেয়।' বিরোধী দলের নেতাদের কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'কেউ কেউ বলতেন আমরা বুঝি না। আমি তাদের বলি, আপনার মন যদি ভারতীয় হয় তবে আপনি বুঝতে পারবেন। কিন্তু আপনার মন যদি ইতালির হয়, আপনি কখনই বুঝতে পারবেন না।'। কেউ যদি কেন্দ্র ও তার নীতির বিরুদ্ধে কথা বলেন সেই ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হবে না। এটা তার বাক্স্বাধীনতা। কিন্তু যে কেউ যদি সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে জড়িত হয় বা দেশের বিরুদ্ধে কাজ করে তাদের কঠোরতম সাজা দেওয়া হবে এবং যারা দেশের ক্ষতি করবে তাদের কাউকেই ছাড়া হবে না।

সিআরপিসিতে ৪৮৪টি বিভাগ ছিল, এখন এতে ৫৩১টি বিভাগ থাকবে। ১৭৭টি বিভাগে পরিবর্তন করা হয়েছে এবং ৯টি নতুন বিভাগ যুক্ত করা হয়েছে। ৩৯টি নতুন উপধারা যুক্ত করা হয়েছে। ৪৪টি নতুন বিধান যোগ করা হয়েছে। তিনি জোর দিয়েছেন যে 'তারিখ পে তারিখ' বছরের পর বছর ধরে চলেছে এবং এটি দরিদ্রদের জন্য ন্যায়বিচার কঠিন করে তুলেছে। '...গরিবদের জন্য, ন্যায়বিচার পাওয়ার সবচেয়ে বড়ো বাধা আর্থিক চ্যালেঞ্জ। পুলিশ বিচার ব্যবস্থাকে দায়ী করে। সরকার পুলিশ ও বিচার বিভাগকে দোষারোপ করে। নতুন ফৌজদারি বিলে ধর্ষণের বিধান সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমরা বলেছি তদন্ত করা উচিত ফরেনসিক সায়েন্সের ভিত্তিতে... বিশেষ করে ধর্ষণের ক্ষেত্রে, ফরেনসিক সায়েন্স এবং সর্বশেষ প্রযুক্তির ব্যবহার করে এই ধরনের তদন্ত করা গুরুত্বপূর্ণ'। তিনি আরও বলেন, 'এখন এই আইনের পর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের সমান ও অভিন্ন ব্যবস্থা থাকবে। পুরনো আইনে অনেক অপরাধকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি... অনেক অপরাধকে আইনে উপেক্ষা করা হয়েছে। আমরা ধর্ষণ, গণধর্ষণ, খুন, অপহরণের মতো অপরাধগুলোকে সামনে নিয়ে এসেছি।'

নতুন বিল অনুযায়ী সময়রেখা হলো, ১. অভিযোগের ৩ দিনের মধ্যে এফআইআর দায়ের করতে হবে। ২. এখন তদন্ত বাকি থাকার অজুহাতে পুলিশ চার্জশিট দাখিল করতে অনেক বেশি সময় নেয় নতুন আইনে ১৮০ দিনের বেশি চার্জশিট ঝুলিয়ে রাখতে পারে না। ৩.আগের চার্জশিটগুলি ৬০-৯০ দিনের মধ্যে দাখিল করতে হতো কিন্তু 'পুনঃতদন্ত' উল্লেখ করে অনেক চার্জশিট দাখিল করা হয়নি। নতুন বিলের অধীনে পুলিশকে আরও তদন্ত করার জন্য আদালতের বিশেষ আদেশ প্রয়োজন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চার্জশিট দাখিল করতে হবে। ৪. তদন্ত প্রতিবেদন, অনুসন্ধান এবং বাজেয়াপ্তকরণ প্রতিবেদন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে জমা দিতে হবে। ৫. আগে মেডিক্যাল রিপোর্ট দিনের পর দিন ঝুলিয়ে রাখা হতো... এখন ধর্ষণের ক্ষেত্রে ১ সপ্তাহের মধ্যে মেডিকেল রিপোর্ট দিতে হবে। ৬. বিচারকরা ৪৫ দিনের বেশি বিচারদান ধরে রাখতে পারবেন না। সাত বছরের বেশি কারাবাসের ক্ষেত্রে ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবোরেটরি দলের পরিদর্শন বাধ্যতামূলক।

দেশের স্বাধীনতার লগ্নে যে কাজ করা জরুরি ছিল তা এতদিনে করা হলো। এইবার মানুষ সুবিচার পাবে ও ঔপনিবেশিক মানসিকতার শৃঙ্খলমুক্ত হবে। □

শ্রীরামমন্দির উদ্বোধনেও এত অস্বস্তি কেন বিরোধীদের?

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

জাতীয় হৃদয় যখন সম্মিলিত রামমন্দির নামক আপন সুরক্ষিত নীড়ে, ভারতের মনোময় প্রাণময় ধারাকে অবিচ্ছেদ্য রাখে। আসন্ন সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। উদ্বোধন হবে শ্রীরামমন্দির। একটুও বিস্মিত নই; যখন দেখলাম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে চিঠি লিখে জানান দেওয়া হলো যে তারা রামমন্দির উদ্বোধনের দিনে উপস্থিত হবেন না। অর্থাৎ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন। বিস্মিত নই, কারণ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, ওটা ভারতীয় কমিউনিস্ট হতে পারেনি। একই তানে ছন্দে রামমন্দির বিরোধিতা করে চলেছে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস থেকে শুরু করে আরও বেশ কিছু রাজনৈতিক দল যাদের কাছে মুসলমান তোষণ এবং তোষণ সর্বস্ব ভোটব্যাংক অধিক গুরুত্ব পায় এই দেশের ঐতিহ্য, গরিমা, বহুত্ববাদ ও অস্মিতার চাইতেও। সেই সব নির্দিষ্ট ভারতআত্মাবিরোধী সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক-নির্ভর রাজনৈতিক দলগুলি আগেও শ্রীরামমন্দিরের বিরোধিতা করেছিল, তারপর ৫ আগস্ট ২০২০ যেদিন ভূমিপূজা হয় এবং আজকেও রামমন্দির উদ্বোধন আমন্ত্রণে প্রত্যাখ্যান, বিরোধিতা এমনকী কেউ কেউ মশকরা করছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে ২৬ ডিসেম্বর ২০২৩ লিখেছেন 'It is most unfortunate that the BJP and RSS have converted a religious ceremony into a State sponsored event directly involving the Prime Minister...' এ আমাদের কাছে আরও বড়ো Unfortunate, যিনি বিরোধী কণ্ঠ যার নামে রাম সীতা দুইই বিদ্যমান, তিনি কেন মানতে পারছেন না শ্রীরামচন্দ্র ও রামায়ণ আসলে অখণ্ড ভারতের অমৃত বায়ু। রামকে তারা বিশ্বাস করেন না। তারা রামের অস্তিত্ব জন্ম ইত্যাদি বিষয়ে টিপ্পনী করেন। কিন্তু শ্রীরাম যে এমন চরিত্র যা প্রজাকল্পে লেনিন কিংবা স্তালিনের হিরোত্ব ঘুরিয়ে দিতে পারে, সেই সঙ্কটেই কি তারা রাম বিরোধী? তাদের কী মেনে নিতে পীড়া হচ্ছে এই মন্দির কোনো নিছক উপাসনাঘর নয়? এ হলো 'সেই অখণ্ড অমৃতপিপাসুদেরই চিরপরিচয় বহন করিতেছে...।'

'ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প' 'তারই মূর্তির নাম শ্রীরামচন্দ্র। তাই রামমন্দির বিরোধ আদতে ভারতের শাশ্বত আদর্শবোধের বিরোধ, জাতীয়তাবোধের বিরোধ, দেশ মাতৃকার প্রতি তা অসম্মান। রাষ্ট্রনীতির প্রতীক হোক শ্রীরামমন্দির, তার বিরোধ কেন ভোটের জন্য বারবার হবে! প্রত্যেক বিরোধীর মনে রাখতে হবে শ্রীরামমন্দির কোনো নিছক ভাঙা গড়ার ঘটনা নয়। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সময় থেকেই ভোট টানাপোড়েনে পড়ে রামমন্দির নির্মাণ। রামমন্দিরের অজস্র নিদর্শন, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ দলিলে গবেষণায় সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু তা তার সাহসী সমাধান আর হচ্ছিল না দশকের পর দশক ধরে। ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতি সর্বসম্মত ভাবে শ্রীরামমন্দির নির্মাণের রায় প্রদান করা হয় যার প্রতিটা অক্ষরে প্রতিপাদ্য হয়েছে পুরা মন্দিরের অস্তিত্ব। যা কোনো রূপেই প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক প্রমাণের একচুলও দুর্বল করা যায়নি। তাই বিচারের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত এবং রায় তাতো নিজস্ব ছন্দেই নিরপেক্ষ এবং সেকুলারদের পছন্দের শব্দানুযায়ী 'ধর্মনিরপেক্ষ' তো বটেই। তবে কোন যুক্তিতে সেকুলার মননের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা বলেন এটা ধর্মনিরপেক্ষ নয়? বরং তারা বলুন, এতে এক অংশের মুসলমান বিরুদ্ধবাদী বেজায় অসন্তুষ্ট। এবং তাদের আর চটাতে চায় না ইয়েচুরি থেকে কংগ্রেসের কপিল সিব্বল। আরও একটা বিষয়, ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচনী সংকল্পপত্রে রামমন্দির নির্মাণের প্রতিশ্রুতি সেই কবে থেকেই লেখা। রামমন্দির যদি অসাংবিধানিকই (যে অজুহাতে বিরোধী নেতারা রামমন্দির উন্মোচনের দিন আসছেন না) তবে তো তা নির্বাচনী বিধিতেই থমকে যেত।

> **ভারতের মহৎ গুণ প্রেম, উন্নত চিত্ত এবং রাষ্ট্রবোধের শিলান্যাসের নাম শ্রীরামমন্দির। আস্তিক, নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে রামমন্দির এক আস্ত পুণ্য Image of Bharat.**

কংগ্রেসের হিন্দুত্ববিরোধী জিন নতুন নয়। স্বাধীনতার পর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল যখন সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য উদ্যত হন এবং মন্দির উদ্বোধনের দিন আমন্ত্রিত হন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ। রাষ্ট্রপতি ২ মার্চ, ১৯৫১ সালে নেহরুকে পত্র মারফত জানান তিনি মন্দির উদ্বোধনের দিন যাবেন। কারণ নেহরুর বেজায় আপত্তি ছিল। প্রত্যেক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের চিঠি দিয়ে তিনি অনুপস্থিত

ফঃ ২

থাকার নির্দেশ দেন। তাই আজ যদি সোনিয়া গান্ধী কিংবা কপিল সিব্বলরা উপস্থিত না থাকেন তাতে বিস্মিত নই একটুও।

বিস্মিত কেন হব! ১০ নভেম্বর ২০২৩-এ খোদ কংগ্রেসেরই বর্ষীয়ান নেতা আচার্য প্রমোদ কৃষ্ণম বলেন, এই দলের অনেকেই রামমন্দির এবং শ্রীরামচন্দ্রকে ঘৃণা করে। এবং আচার্য সত্যেন্দ্র দাস, টেলিভিশন অনুষ্ঠানেই তাঁর মন্তব্যে সিলমোহর দেন। প্রমোদ কৃষ্ণমের মন্তব্যের টাটকা প্রমাণ উপস্থিত, গত জুন মাসে কংগ্রেসের এলিট লিডার শ্যাম পিত্রোদা রাহুল গান্ধীর এক অনুষ্ঠানে সরাসরি রাম বিরোধিতা করলেও রাহুল গান্ধী টুঁ শব্দ করলেন না। আমরা তো ভুলে যাইনি দুঁদে উকিল কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বলের মহামান্য শীর্ষ আদালতের নিকট সেই আপিলের কথা। যেখানে তিনি আবেদন করছেন ২০১৯ লোকসভার পর যেন রামমন্দির সংক্রান্ত শুনানি করা হয়। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন 'কীসের তাড়া?' শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে আগ্রাসনের ইতিহাস, মিথ্যাচারের ইতিহাস প্রতিষ্ঠিত তা থেকে মুক্তির তাড়া সমগ্র ভারতীয়ত্বের।

আরও আশ্চর্য এই যে, সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড, যারা রামমন্দির মামলার অংশ, তারাও নাকি কপিল সিব্বলকে এমন কোনো আবেদন করতে বলেননি। এর থেকেই স্পষ্ট 'সেকুলার' ছদ্মনামে যারা রাজনীতি করেন তারা নির্দিষ্ট ভাবে কোন ভোটব্যাংকেই আগ্রহী। এবং কিছু কিছু কংগ্রেস নেতা এতটাই সংকীর্ণ যে তারা নিজের রাজনৈতিক আসন সামলাতে শ্রীরাম চরিত্রের সঙ্গে রাহুল গান্ধীর তুলনা টানতেও পিছপা নন। যেমন মহারাষ্ট্রের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নানা পাটলি। শ্রীরামচন্দ্র কিংবা আদি শঙ্করাচার্য যেমন ভারততীর্থ করেছেন রাহুলও তেমন করছেন। আরও রং চড়ালেন রাজস্থানের নেতা প্রসাদীলাল মীনা। রাহুল গান্ধী বুঝি রামচন্দ্রের চাইতেও অধিক ভারত পরিভ্রমণ করেছেন (বক্তব্য : ১৭-১০-২২)

আজকে কংগ্রেসের মধ্যেই দ্বিমত। কমলনাথের মতো কংগ্রেসী নেতা কংগ্রেস পদ সামলাবেন নাকি রামমন্দির সমর্থন করবেন তা নিয়ে দ্বিধায়। সুর সামান্য নরম করলেও এঁরা কখনও রামমন্দির এবং শ্রীরাম চরিত্রের বিকৃতিতে বিরোধিতা করতে পারেন না। ২০২০ সালে রামমন্দিরে ভূমিপূজার দিন কংগ্রেস নেতা কুমার কেতকর সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ্যে বলেন রামের কোনো অস্তিত্ব নেই। সেদিন কংগ্রেস কেতকরের কী বিরোধ করবে, বরং রে রে চলছে কালো বস্ত্রে প্রতিবাদ কর্মসূচি। প্রশ্ন উঠছে, কেন একটা হাসপাতাল তৈরি হলো না। কে দিচ্ছে মন্দির তৈরির টাকা! করোনার মধ্যেই রামমন্দির! এমন হাজার অনর্থক অযৌক্তিক এবং মিথ্যাচারী অপপ্রচার। ২০০৭-এর সেপ্টেম্বর যখন দেশের গদিতে ইউপিএ-১ সরকার--- সেদিনও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছিল রামের কোনো ঐতিহাসিক দলিল প্রমাণ নেই এবং একটি হলফনামায় জমা হলো সে মন্তব্য। বাদ যান কেন শশী থারুর? তিনি তাঁর বই Why I am a Hindu-তে উল্লেখ করছেন— Good Hindu হলে সে কিছুতেই বাবরি ধ্বংসের ওপর তৈরি রামমন্দিরে যাবেন না।

কারা Good Hindu? দিগ্বিজয় সিংহ। যিনি ২০২১-এর জানুয়ারিতে বলছেন রামমন্দির হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভাজন তৈরি করছে। অথবা রাজা রাম (কংগ্রেসের সেবা দল) যে নির্লজ্জতার সীমা অতিক্রম করে বলেন রামমন্দিরে তো আমরা কংগ্রেসিরা 'ফলানা' করতেও যাব না (২৬.২.২১)। বারা সিংহ সোলাঙ্কি বলছেন— রাম শিলা পূজার শিলায় সারমেয় 'ফলানা' করে। কান্তিলাল বুরিয়া বলছেন— বিজেপি নেতারা রামমন্দিরের চাঁদায় মদ্যপান করে। মণিশঙ্কর আইয়ার থেকে কে করেননি অপমানজনক মন্তব্য?

শশী থারুর তাঁর নিজের বিচারে নিশ্চিত যে তিনি Good Hindu! তবে ২৭ ডিসেম্বর রাতে তিনি হঠাৎ টুইট করলেন যে তাঁকে বুঝি রামমন্দির উদ্বোধনে আমন্ত্রণ করাই হয়নি। অথচ তার একদিন আগেই কংগ্রেস বামেদের সঙ্গে এক সুরে বলল রামমন্দির 'Symbol of injustice!' আবার ঠিক এক সপ্তাহ আগেই দিগ্বিজয় সিংহ বলেছিলেন সোনিয়া গান্ধী নাকি Very positive on this matter! তারপর যেই না বাম নেতা বেঁকে বসলেন অমনি কংগ্রেসের মজ্জাগত তোষামোদী সেকুলার সত্তা প্রবল আন্দোলিত হলো। কংগ্রেস সব শিষ্টাচারের সীমা ধূলিসাৎ করল যখন ডিসেম্বর ১১-তে গুজরাট কংগ্রেসের হিতেন পিথদিয়া আসন্ন রামমন্দির উদ্বোধনের মুখ্য পুরোহিত যুবক মোহিত পাণ্ডের রগরগে অশালীন বিকৃত মিথ্যা (fake/morphed) ছবি সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করল। তারপরেও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ন্যূনতম দুঃখ প্রকাশ কিংবা ক্ষমা প্রার্থনা দেখিনি। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বামমনস্ক এবং সেকুলারবাদী অনেকেই হয়তো রামমন্দির উদ্বোধনের দিন অসংখ্য ঋণাত্মক মন্তব্য করবেন। করুন। সেওতো সাংবিধানিক অধিকার। তবে তারা যেন মনে রাখেন এটা রামমন্দির নির্মাণ নয়। এ হলো রামমন্দির পুনর্নির্মাণ। সুশীল সমাজ আশাকরি শব্দেই অর্থ খুঁজে নেবেন। ভারতের মহৎ গুণ প্রেম, উন্নত চিত্ত এবং রাষ্ট্রবোধের শিলান্যাসের নাম শ্রীরামমন্দির। আস্তিক, নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে রামমন্দির এক আস্ত পুণ্য Image of Bharat।

শ্রীরামচন্দ্র জাতিসত্তার মেরুদণ্ড। সেই জাতিসত্তার নাম ভারতীয়। রামায়ণী ভাবে ভঙ্গিতে যে ভারত অক্সিজেন নেয়, তা সত্যের পথে লক্ষ্য স্থির করুক। বিরোধী রাজনৈতিক দলের বিরোধ করার মাত্রা ভঙ্গিমা যেন তাদের আরও অপ্রাসঙ্গিক করে না দেয়। কংগ্রেস-সহ যে যে রাজনৈতিক দল শ্রীরামমন্দিরের বিরোধিতা করছে, নিশ্চিত, তারা প্রাচীন ভারতের ব্যাপকতা, উদারতা, ঐতিহ্যে শ্রদ্ধা রাখে না। তারা অধিক ভরসা করে ইসলামিক আগ্রাসনের মধ্যযুগীয় ইতিহাসকে। ভোটব্যাংক আনুগত্য তাই তাদের বেশি দরকার। নিশানধারী বিরোধীরা নির্লজ্জের মতো রামমন্দির এবং শ্রীরামচরিত্রের সমালোচনা করে নিজেদেরই রাজনৈতিক ভরা কলির দুর্লক্ষণ আমন্ত্রণ করছে। বাম-কংগ্রেস যে রাজনৈতিক সহমরণে আগ্রহী তা আর বুঝতে বাকি নেই। বিরোধীদের বিদ্রূপ, উপেক্ষা, সমালোচনার কষ্টিপাথরেই চির স্বতন্ত্র ইতিহাস তৈরির পথে শ্রীরামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিন।

শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ শুধু উত্তর ভারতের নয়, বঙ্গভূমিরও

ড. শ্যামল পাল

ভগবান শুধু কোনো জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় ও নির্দিষ্ট স্থানের হয় না। ভগবান তো সবাইকে সমান চোখে দেখেন। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনীতির এত অধঃপতন হয়েছে যে, এক-এক স্থানের ভগবান এক-একজন হবেন। যেভাবে রাজনীতিতে এক-একটি নির্বাচনী এলাকার এক-একজন প্রতিনিধি থাকে। বিগত কয়েক বছর ধরে আমাদের রাজ্যে আলোচনা চলছে ভগবান রামচন্দ্র নাকি উত্তরপ্রদেশের, বাঙ্গালিরা ভগবান রামের পূজা করেন না। কিন্তু দীর্ঘকালের ইতিহাসে শুধু বাঙ্গালি নয়, ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষাভাষী ও অঞ্চলের মানুষ ভগবান রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে আসছেন। বর্তমানে অযোধ্যায় ভগবান রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে সারা ভারতবর্ষের মতো পশ্চিমবঙ্গেও উৎসাহের জোয়ার এসেছে। বিগত কয়েক বছর ধরে সারা পশ্চিমবঙ্গে রামনবমীর শোভাযাত্রায় মানুষের স্বতস্ফূর্ত যোগদান প্রমাণ করে দিয়েছে যে প্রতিটি বাঙ্গালির রোমে রোমে শ্রীরাম বাস করেন। দুর্গাপূজায় কলকাতার সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে রামমন্দিরের আদলে প্যান্ডেল করায় সারা রাজ্যে সাড়া পড়ে যায়। হাজার হাজার মানুষ ওই প্যান্ডেল দর্শন করার জন্য কলকাতা সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে এসে উপস্থিত হয়। আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা তো বলারই দরকার নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অনেক বছর আগেই বঙ্গপ্রদেশের গ্রামেগঞ্জে, আনাচেকানাচে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম ও বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। প্রতিবছর জন্মাষ্টমীতে বাঙ্গালিরা ঘটা করে শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন পালন করেন। আর কার্তিক মাসে ভোরবেলা এরাজ্যের গ্রামেগঞ্জে হরিনাম কীর্তন শুনে গ্রামবাসী ঘুম থেকে ওঠেন।

বর্তমানে একদিকে যেমন শ্রীরামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার নিমন্ত্রণ পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে, ঠিক অন্যদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী গীতা জনে জনে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কলকাতায় ব্রিগেডে হয়েছে লক্ষকণ্ঠে গীতাপাঠের আয়োজন। আগামী ২২ জানুয়ারি আযোধ্যায় নবনির্মিত শ্রীরামমন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান। সেখানে দেশের বিশিষ্ট সাধুসন্ত, বিভিন্ন মঠ মন্দিরের প্রমুখ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। পৃথিবীর পঞ্চাশটি দেশের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত থাকবেন। কিন্তু সমস্ত ভারতবাসীর কাছে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র হলেন মর্যাদা পুরুষোত্তম ও আদর্শ পুরুষ। গত দু'বছর আগেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের লোকেরা নিজেদের উপার্জিত অর্থ থেকে শ্রীরামমন্দির নির্মাণের জন্য হাত খুলে সমর্পণ করেছেন। যেহেতু ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সমগ্র ভারতবর্ষ তথা সমগ্র হিন্দু সমাজের আরাধ্য, সেই কারণে হিন্দু সমাজের সর্বস্তরের মানুষের যোগদান এই মন্দিরে থাকা দরকার। এই উদ্দেশ্যেই মন্দির নির্মাণ কমিটি সারা ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের কাছে আবেদন রেখেছিলেন। তার প্রাণপ্রতিষ্ঠায় সমস্ত ভারতবাসী যেতে না পারলেও তার প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিন সমস্ত ভারতবাসীর নিজের নিজের গ্রামের মন্দিরে সমবেত হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের ভজন-কীর্তন করবে বলে নিশ্চিত করেছে। শ্রীরামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার বিষয় যাতে কারো কাছে অজানা না থাকে তার জন্য প্রত্যেক গৃহে আমন্ত্রণপত্র, শ্রীরামলালার ছবি ও অযোধ্যায় পূজিত অক্ষত চাল পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে জোর কদমে।

অযোধ্যায় পূজিত অক্ষত চাল নিয়ে বাঙ্গালিদের মধ্যে এক উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছে। বিগত কয়েক দিনে রাজ্যের প্রতিটি জেলা কেন্দ্রে কলস ভর্তি অক্ষত চাল নিয়ে এক বর্ণাঢ্য শোভা যাত্রার মাধ্যমে বাঙ্গালিদের কাছে ভগবান রামচন্দ্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চলেছে। এই শোভাযাত্রায় শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বাঙ্গালিদের আবেগ কতটা তা স্পষ্ট হয়ে হয়েছে। শুধুমাত্র প্রতিটি জেলা কেন্দ্রেই নয় জেলার বিভিন্ন ব্লক কেন্দ্র তথা প্রমুখ স্থানেও অক্ষত চাল নিয়ে শোভাযাত্রার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন সারা রাজ্য আজ রামময় হতে চলেছে।

এই শোভাযাত্রায় নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, ধনী-নির্ধন সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন। সোশ্যাল মিডিয়া তথা ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটস্‌অ্যাপ ও ইউটিউব থেকে শুরু করে প্রতিটি জায়গায় কলস ভর্তি অক্ষত চাল-সহ শোভাযাত্রার ছবি দেখা যাচ্ছে। শুধুমাত্র সোশ্যাল মিডিয়া নয় , আজকের বিভিন্ন প্রিন্ট ও ডিজিটাল মিডিয়াতেও শ্রীরামচন্দ্র ছেয়ে গেছে। মনে হচ্ছে যেন এক যুগের অবসান হয়ে আর এক যুগের সূচনা হতে চলেছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত গীতার বাণী বীর যোদ্ধা অর্জুনের মতো ব্যক্তিত্বের জীবনের দিশা বদল করে দিয়েছিল। মনে করা হয় গীতা এমন একটি পুস্তক যা পাঠ ও শ্রবণে মানুষের পুণ্যলাভ হয়। হিন্দুরা গীতাকে এত পবিত্র মনে করে যে তারা গীতাকে সুন্দর করে লাল কাপড়ে গুটিয়ে ঠাকুরঘরে রেখে তার পূজা ও পাঠ করেন। যদিও সর্বকালে গীতার বাণী রাজনীতি থেকে শুরু করে সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি পথপ্রদর্শক হয়ে আছে। আর এই কারণেই কয়েক বছর ধরে 'গীতা জয়ন্তী' উপলক্ষ্যে গীতাপাঠের আয়োজন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গীতাকে এখন ঘরে, মন্দিরে , ঠাকুরের পাশে নয়, প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেওয়ার এক উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এই উপলক্ষেই গত বছর নদীয়ার মায়াপুরে প্রায় পাঁচহাজার নর-নারী একসঙ্গে গীতার মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলেছিলেন। তার খবর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যায়। এ বছর আরও বড়ো আকারের এই ধরনের লক্ষকণ্ঠে গীতাপাঠের আশোজন হয়েছিল কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। যদিও এই আয়োজন করতে গিয়ে আয়োজকরা যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। যুবসমাজকে গীতার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যই এই ধরনের কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। যুব সমাজের একাংশ যারা কর্মসংস্থানের খোঁজে প্রতিনিয়ত পড়াশোনা করে চলেছে প্রাইমারি টেট পরীক্ষা দেবে বলে। এই প্রাইমারির টেট পরীক্ষা ডিসেম্বর মাসের ১০ তারিখে হওয়ার কথা ছিল। লক্ষকণ্ঠে গীতাপাঠ আয়োজকদের অভিযোগ, রাজ্য সরকার চক্রান্ত করে সেই টেট পরীক্ষা ১০ তারিখ থেকে পিছিয়ে ২৪ তারিখ করে। যাতে করে বিপুল সংখ্যক টেট পরীক্ষার্থী কোনো মতেই এই গীতা পাঠের কার্যক্রমে উপস্থিত না থাকতে পারে।

তবে যত যাই হোক না কেন ভারতের আত্মাস্বরূপ ভগবান শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের বাণী ও আদর্শের প্রচার ভারতের তথা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যুগোপযোগী ও ফলদায়ী। আজকে ইসকনের প্রচেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণের নাম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঘটা করে আনন্দ সহকারে গাওয়া হচ্ছে। হিন্দুধর্মের উদারতা ও মহত্ত্ব লক্ষ্য করে হাজার হাজার অহিন্দু নর-নারী শ্রীকৃষ্ণের টানে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করছেন। আজকের সোশ্যাল মিডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়ার দৌলতে আমরা এ ব্যাপারে অতি সহজেই জানতে পারছি। তাই শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ-সহ শুধু ভারতই নয়, সমগ্র বিশ্বের আরাধ্য। □

অর্থাগমে তীর্থ পর্যটনের বিরাট ভূমিকা রয়েছে

দুর্গাপদ ঘোষ

কোনো কথার অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন না করে কিছু লোক বিরূপ মন্তব্য ও কটাক্ষ করে থাকেন। বিশেষ করে রাজনীতির লোকেরা। তথ্য ও বাস্তবতার পরোয়া না করে এটাকে তাঁদের দলীয় রাজনীতির মুনাফা তোলার মূলধন মনে করেন। গত ১২ নভেম্বর রাজস্থানে বিধানসভার নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে ২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় পুনর্নির্মিত শ্রীরামমন্দিরে রামলালার বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর ওই তীর্থক্ষেত্র থেকে সোনা ফলবে। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কথা। অর্থাৎ সেদিনের পর থেকে দেশ-বিদেশের রামভক্ত ও অন্যান্য তীর্থ পর্যটনকারীরা এত বেশী সংখ্যায় অযোধ্যায় আসবেন যে তাঁদের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে অর্থাগম হবে। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন না করে অথবা বিরোধিতা করতে হবে বলে প্রতিপক্ষের কোনো কোনো নেতা সমালোচনা এবং স্বভাবসুলভ কটাক্ষ করেছেন। কেউ কেউ এমনও মন্তব্য করেছেন যে ওই রামমন্দিরের তলায় সোনার খনি তৈরি করা হচ্ছে এবং সেখান থেকে তাল তাল সোনা বেরিয়ে আসবে।

বস্তুত ধর্মীয় তীর্থযাত্রা বা তীর্থ পর্যটনের মাধ্যমে যে মোটা অর্থ উপার্জন হয়ে থাকে এটা একটা বাস্তব ঘটনা। ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি)-এর ৭ শতাংশ এবং সেই বিপুল পরিমাণ অর্থের সিংহভাগই আসে মঠ-মন্দিরে তীর্থ পর্যটন থেকে। ধর্মীয় পর্যটন এবং অর্থনীতির মধ্যে গভীর সম্বন্ধ রয়েছে। কিন্তু কিছু রাজনীতিক ছাড়াও সমাজের প্রথিতযশা আরও কিছু লোকও ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে অযোধ্যায় রামজন্মভূমি মুক্তি ও রামমন্দির পুনর্নির্মাণ আন্দোলন শুরু হবার সময় থেকে নানা ধরনের মত ও মন্তব্য প্রকাশ করে আসছেন। কেউ বলেছেন এখানে মন্দির না বানিয়ে হাসপাতাল করা হোক। কেউ বলেছেন কারখানা বানানো হোক। প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় চুনী গোস্বামী তো ওখানে মন্দিরের বদলে স্টেডিয়াম বানানো হোক বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। এখনো কেউ কেউ বলে থাকেন, মন্দির টন্দির বানিয়ে অর্থের অপচর করার কী দরকার! অবশ্য বাবরি মসজিদ কমিটিকে মসজিদ বানানোর জন্য অযোধ্যায় যে জমি দেওয়া হয়েছে সেখানে মসজিদ বানিয়ে 'অর্থের অপচয়' করার কী দরকার এমন মত কেউ প্রকাশ করেছেন বলে শোনা যায়নি। মঠ-মন্দিরের পেছনে 'অর্থের অপচয়' নিয়ে যাঁরা অতিরিক্ত মাত্রায় চিন্তিত তাঁদের যত আপত্তি-উন্নাসিকতা দেখা যায় কেবল মন্দিরের বেলায়।

এই নিবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় হলো অযোধ্যায় রামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণে 'অর্থের অপচয়' নিয়ে। সেজন্য ধর্মীয় বা তীর্থ পর্যটনে অর্থ ছাড়াও আরও যে সমস্ত ইতিবাচক দিক যেমন মানব মিলন, সাংস্কৃতিক সদ্ভাব প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে আলোচনায় বেশি না এনে এখানে কেবল তীর্থ পর্যটনের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনার চেষ্টা থাকবে। ঘটনা হলো, অর্থনীতির প্রাথমিক

জ্ঞানটুকুও যাঁরা যাখেন এবং বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে যাঁরা অবহিত তাঁরা জানেন যে যেকোনও তীর্থস্থল গড়ে ওঠে তখন তাকে কেন্দ্র করে অর্থনীতির চক্রবৃদ্ধি ঘটে। পূজাপার্বণ, যাগযজ্ঞ, প্রার্থনা বিভিন্ন সময়ে ধর্মীয় উৎসবাদির মাধ্যমে অর্থের বিনিয়োগ ও বিকেন্দ্রীকরণ হয়ে থাকে এবং তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিম্বা এককেন্দ্রিক নয়, সার্বিক। কেবলমাত্র পুরোহিত, যজমান, গ্রন্থী, যাজকদের উপার্জন হয় তা নয়। ফুল উৎপাদনকারী থেকে প্রসাদ সামগ্রী নির্মাতা সকলেই লাভবান হন। পারস্পরিক অনুষঙ্গ হিসাবে লাভবান হন ফুলমালা বিক্রেতা থেকে শুরু করে রিক্সা-টোটো-অটো চালকরা। ধর্মস্থান কেন্দ্রিক উৎসবাদির পরিসর সাজানোর সামগ্রী নির্মাতা ও বিক্রেতাদের যেমন অর্থাগম হয় তেমনি উপার্জন হয়ে থাকে যাঁরা সাজানোর কাজ করেন অর্থাৎ ডেকরেটার এবং তাঁদের শ্রমিক- কর্মীদেরও। কোনো ধর্মস্থানে নিয়মিত বেশি মাত্রায় ফুলপাতা নিবেদিত হলে তা থেকে খুব কম খরচে জৈব সার তৈরি হতে পারে যা ব্যবহার করে তুলনামূলকভাবে অনেক কম খরচে পরিবেশবান্ধব ফসল ফলাতে পারেন সাধারণ কৃষকরা। তীর্থযাত্রীদের থাকা-খাওয়ার জন্য হোটেল-রেস্তোরাঁ মালিকদের আয় বৃদ্ধি হয়। সেসব বেশি মানুষ থাকা-খাওয়া করলে সেখানে রাঁধুনি, পরিচারক এবং সাফাইকারীসহ অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ হয়। সাজানোর জিনিস যেমন শোলার কাজ, জরি-পুতির কাজ যাঁরা করেন অবধারিতভাবে আয় বৃদ্ধি পায় তাঁদেরও। এইভাবে স্থানীয় ক্ষেত্র থেকে আরম্ভ করে দূরদূরান্তর পর্যন্ত মানুষের অর্থ উপার্জনের পথ খুলে যায়। আয়ের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। যাঁরা সরকার স্বীকৃত বাজি তৈরি করেন, প্রদীপ, মোমবাতি, ধূপকাঠি বানান আয়ের পথ খুলে যায় তাঁদেরও। সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে কোনও নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডে কোনো কারখানা কিংবা হাসপাতাল তৈরি হলে যত মানুষের কর্মসংস্থান হতে পারে তার চাইতে অনেক গুণ বেশি মানুষের উপার্জনের সংস্থান হতে পারে মঠ-মন্দির হলে। তার মানে এই নয় যে কলকারখানা কিংবা হাসপাতালের দরকার নেই। অবশ্যই দরকার এবং জরুরিও বটে। কিন্তু তা মন্দিরের জায়গায় কিংবা মন্দিরের বদলে করতে হবে এমন তো কোনো কথা কিংবা বাধ্যবাধকতা নেই। মন্দিরের জায়গায় এবং মন্দিরের বদলে সেসব করা হলে তাতে অন্তত অধিকতর মানুষের কর্মসংস্থানের পথ সুগম হয় না। তাছাড়া মঠ মন্দিরে নিত্যদিন পূজাপাঠ, উপাসনা ইত্যাদি হয়ে থাকে। আর হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির কথাই যদি ওঠে তাহলে বলা যেতে পারে যে এদেশে অনেক মঠ-মন্দির এবং ধর্মীয় সংস্থা আছে যারা খুব কম খরচে হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং উঁচু মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে থাকে। অযোধ্যায় রামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র পরিচালকদেরও এরকম পরিকল্পনা আছে বলে জানিয়েছেন শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র অছি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই।

কাশী বিশ্বনাথ ধাম সংস্কারের পর গত ২ বছরেরও কম সময়ে সেখানে তীর্থ পর্যটকের সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১ সালের ১৩ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই মন্দির চত্বরের করিডোরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। তারপর থেকে গত ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত পর্যটকের সংখ্যা বেড়েছে ১ হাজার শতাংশ বা ১০ গুণেরও বেশি। তার আগে পর্যন্ত প্রতিদিন তীর্থযাত্রীর আগমন হতো গড়ে ১৮ হাজারের মতো, মাসে প্রায় ৫ লক্ষ ৪০ হাজার। বছরে ৬৪ লক্ষ ৮০ হাজার বা প্রায় ৬৫ লক্ষ। এখন সেখানে তীর্থ পর্যটনে আসছেন প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২ লক্ষ ভক্ত। মাসে প্রায় ৬০ লক্ষ। বছরে প্রায় ৭ কোটি ২০ লক্ষ। এর মধ্যে অধিকাংশই হলেন নথিভুক্ত পর্যটক। পর্যটন বিভাগের তথ্য অনুযায়ী গতবছর অর্থাৎ ২০২৩ সালের ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ ১১ মাসের মধ্যে কাশীধামে তীর্থ পর্যটনে এসেছেন ৫ কোটি ৩৮ লক্ষ ভক্ত। ২০২১ সালের ১৩ ডিসেম্বর থেকে ২০২৩ সালের ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত কেবল নথিভুক্ত ভক্তের সমাগম হয়েছে ১২ কোটি, ৯২ লক্ষ, ২৪ হাজার। এর মধ্যে ১৫ হাজার ৯৩০ জন বিদেশি। তথ্য অনুসারে বিগত ২ বছরের মধ্যে কাশীধামে সবচাইতে বেশি তীর্থ পর্যটক এসেছেন গত আগস্ট মাসে। মে মাসে আগমন ঘটেছে ৯৭ লক্ষ

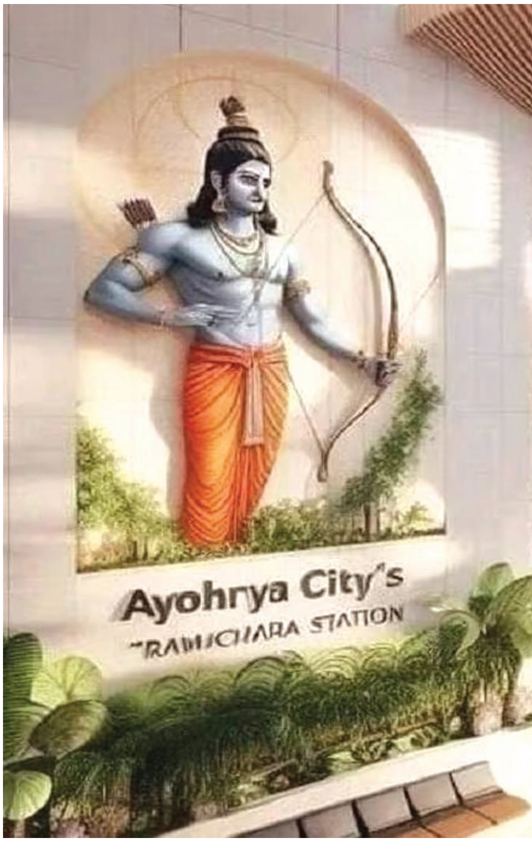

২২ হাজার ২০৬ জনের। জুলাই মাসে এসেছেন ৭২ লক্ষ ৬২ হাজার ৮৯১ জন। এপ্রিলে এসেছেন ৪২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮৫৮ জন। মার্চে ৩৭ লক্ষ ৮১ হাজার ৬০ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৪১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৮০৭ জন এবং জানুয়ারিতে আগমন ঘটে ৪৪ লক্ষ ২৯ হাজার ৫৯০ জন তীর্থযাত্রীর। গত বছরের মে মাসে এসেছিলেন ৩২ লক্ষ ২৫ হাজার ৪৭৬ জন, জুন মাসে ৩৬ লক্ষ ৯৬ হাজার ৩৪৬ জন, সেপ্টেম্বরে ৩৮ লক্ষ ৯৭ হাজার ৮৪৪ জন, অক্টোবরে ৪২ লক্ষ ৫৫ হাজার ৬৭৪ এবং নভেম্বরে আগমন ঘটে ৪৮ লক্ষ ২৬ হাজার ৭৭৬ জনের। এর বাইরে স্থানীয় তথা অনথিভুক্ত তীর্থযাত্রীরাও এই ২ বছরের আগমন হয়েছে অন্তত ১ কোটির মতো। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ২ বছরেরও কমন সময়ে কাশীধামে প্রায় ১৪ কোটি তীর্থ পর্যটক এসেছেন। এই সমস্ত তীর্থ পর্যটকের আসা-যাওয়া, থাকা-খাওয়া, পূজার উপকরণ, দান-দক্ষিণা এবং রুদ্রাক্ষ-সহ নানা জিনিসপত্র কেনাকাটা থেকে পর্যটক পিছু যদি ৫০০ টাকাও অর্থাগম হয়ে থাকে তবে এই

একটামাত্র তীর্থস্থান থেকেই কত টাকার আগমন হয়ে থাকতে পারে তা খুব সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। বছরে প্রায় ৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। পাশাপাশি মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে মহাকাল মন্দির সংস্কারের পর সেখানে তীর্থযাত্রীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক বেশি। ১ হাজার ৭৮৫ শতাংশ বা ১৭.৮৫ গুণ। যথারীতি সমান মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে সার্বিক অর্থাগমও। অযোধ্যায় রামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হবার পার থেকেই সেখানে পর্যটকের আগমনের যেভাবে ঢল নামতে শুরু করেছে তাতে মনে হচ্ছে প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হলে খুব অল্প কালের মধ্যে তীর্থ পর্যটকের আগমনের মাত্রা হয়তো বাকি সমস্ত তীর্থস্থলকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। গত ২৬ ডিসেম্বর মহাকাল মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সেখানে এখন প্রতিদিন প্রায় ৫ লক্ষ ভক্ত সমাগম হচ্ছে।

মঠ-মন্দিরকে কেন্দ্র করে তীর্থ পর্যটনে যে বিপুল পরিমাণে অর্থ উপার্জন হতে পারে এটা অনুধাবন করে ভারত সরকার 'পিলগ্রিমেজ রিজুভিনেশন অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল অগমেন্টেশন ড্রাইভ' বা 'প্রসাদ' নামে একটা জাতীয় মিশন গঠন করেছে। তার ফলে ধর্মস্থানকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন চলছে। শহরাঞ্চলে তো বটেই এমনকী গ্রামীণ ক্ষেত্রেও শুরু হয়েছে 'প্রসাদ' কর্মসূচি। তৈরি হচ্ছে 'স্পিরিচুয়াল ট্যুরিজম সার্কিট' বা ধর্মীয় পর্যটন পরিক্রমা। আর তাকে কেন্দ্র করে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন সড়ক, বিমানবন্দর, যাত্রী নিবাস, বিদ্যুৎকেন্দ্র, রেলপথ, বাসডিপো, অটোরিক্সার স্ট্যান্ড, চিকিৎসাকেন্দ্র ইত্যাদি পরিকাঠামো ও সেবাকেন্দ্র। এককথায় শহর তথা নগরোন্নয়ন। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের এক রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে যে বিশ্ববাসীর শহর তথা নগরমুখী হওয়ার প্রবণতা ও প্রয়োজন অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪ সালে সারা বিশ্বে মোট জনসংখ্যার ৫৪ শতাংশ ছিল শহরবাসী। ১৯৬০ সালের তুলনায় এই বৃদ্ধিহার ৩৪ শতাংশ। অনুমান করা হচ্ছে যে ২০৩০ সালের মধ্যে তা ৬০ শতাংশে পৌঁছে যাবে। অর্থাৎ আগামী ৭ বছরের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী থাকবেন মাত্র ৪০ শতাংশ। পরিকাঠামোর উন্নতি হলে গ্রামীণ ক্ষেত্রগুলোও যে শহরাঞ্চলের রূপ নেয় এটা খুব সাধারণ ব্যাপার। শহরাঞ্চলের উন্নয়ন এবং শহরে বসবাসের এই প্রবণতার পিছনে ধর্মস্থান তথা ধর্মীয় পর্যটনে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি অন্যতম বড় কারণ বলেও জানা গেছে।

ভারতবর্ষ আদতে কৃষিপ্রধান দেশ হলেও এখন একদিকে কৃষিক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা অন্যদিকে কৃষিবিজ্ঞানের আধুনিকতা তথা উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও কৃষি পরিবারগুলোর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে গ্রামীণ ক্ষেত্রের মানুষকে জীবিকার জন্য শহরমুখী হতে হচ্ছে। পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে সেই জীবিকা বা অর্থ উপার্জন বড়ো ভূমিকা নিচ্ছে মঠ-মন্দিরকে কেন্দ্র করে তীর্থ পর্যটন। যা মুখ্যত স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়। এদেশে মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৭৯ শতাংশই হল স্বনির্ভর। বাকি ২১ শতাংশের মধ্যে সরকারি কর্মসংস্থান নিতান্ত কম। তার বাইরে বাকিটা নির্ভর করে বেসরকারি তথা ব্যক্তি মালিকানধীন ক্ষেত্রের ওপর। তীর্থ পর্যটনে স্বনির্ভর কর্মসংস্থান বা অর্থ উপার্জনের সুযোগ সব চাইতে বেশি।

ভারতবর্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটা তীর্থস্থান হলো উত্তরাখণ্ডে হরিদ্বার, হৃষিকেশ, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী (চারধাম)। জম্মু-কাশ্মীরে বৈষ্ণবদেবী, অমরনাথ। উত্তরপ্রদেশে কাশীধাম, মথুরা, বৃন্দাবন, কুশীনগর এবং অবশ্যই অযোধ্যা। পাঞ্জাবে অমৃতসর (স্বর্ণমন্দির), কালরপাটন। রাজস্থানে পুষ্কর ব্রহ্মামন্দির, দিলওয়ারা মন্দির। গুজরাটে সোমনাথ, দ্বারকা। মহারাষ্ট্রে দাদর (সিদ্ধি বিনায়ক), শিরডি (সাইবাবা)। কেরালায় ত্রিশূর (গুরুবায়ুর), শবরীমালা। তামিলনাড়ুতে মাদুরাই, রামেশ্বরম, কন্যাকুমারী। অন্ধ্রপ্রদেশে তিরুপতি। মধ্যপ্রদেশে উজ্জয়িনী। ওড়িশায় পুরী। বিহারে বুদ্ধগয়া। ঝাড়খণ্ডে দেওঘর (বৈদ্যনাথ)। পশ্চিমবঙ্গে কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, তারাপীঠ, তারকেশ্বর, কোচবিহার (মদনমোহন)। অসমে গুয়াহাটি (কামাখ্যা)। এদের প্রায় সবগুলোতেই লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর আগমন ঘটে থাকে। এছাড়া হরিদ্বার প্রয়াগরাজ, উজ্জয়িনী ও নাসিকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর কুম্ভমেলার কথা তো না বললেই নয়। সেখানে

কোটি কোটি পুণ্যার্থীর আগমন ঘটে। বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে ২০২২ সালে নথিভুক্ত তীর্থ পর্যটকের সংখ্যা ছিল ৩৪ লক্ষ ৪০ হাজার। একই বছরে তিরুপতি মন্দিরে সমাগম হয় ৩ কোটিরও বেশি ভক্তের। আর কাশী বিশ্বনাথ ধাম কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে ২০২২ এবং ২০২৩ এই ২ বছরে ১৫ হাজার ৯৩০ জন বিদেশি ১২ কোটি ৯২ লক্ষ ২৪ হাজার (প্রায় ৩ কোটি) তীর্থযাত্রীর আগমন ঘটেছে। উল্লেখিত এই দুই বছরে দীপাবলী থেকে দেব-দীপাবলীর মধ্যে কেবল কাশীধাম ও অযোধ্যায় মাটির প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে প্রায় ৬০ লক্ষ। সেই সব প্রদীপ যাঁরা তৈরি করেছেন, যাঁরা সলতে বানিয়েছেন সেইসব অতি সাধারণ মানুষদের ঘরে এসেছে জীবিকার অর্থ। এর বাইরে তেল-মোমবাতির ব্যবসায়ীরাও আছেন। অনুরূপভাবে অন্যান্য ধর্মস্থানের মাধ্যমে অর্থাগমনের তথ্যও চোখ কপালে ওঠার মতো। উদাহরণ হিসাবে তিরুপতি বালাজী মন্দিরে কী ধরনের এবং কী পরিমাণে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হয়ে থাকে তা অনেকেরই জানা। সোনাদানা তো বটেই কোনো কোনো ভক্ত হাতি পর্যন্ত দান করে থাকেন এই মন্দিরে। কাশীধামে ২০২২ সালে একজন ভক্ত ৬০ কেজি সোনা দান করেছেন।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী এদেশে সামগ্রিকভাবে পর্যটন বিভাগে কর্মরত মানুষের সংখ্যা হলো ৩ কোটি ৯০ লক্ষ। ভারতে কর্মরত মোট জনসংখ্যার ৮ শতাংশ নিযুক্ত রয়েছেন পর্যটন ক্ষেত্রে। দেশের মোট জিডিপি-র ৭ শতাংশই হলো পর্যটন সম্পর্কিত। এবং এই বিপুল পরিমাণ অর্থের সিংহভাগ আসে তীর্থ পর্যটন থেকে। এর মধ্যে বিদেশি মুদ্রার পরিমাণও নিতান্ত কম নয়। ভারতে যত বিদেশি পর্যটক আসেন তাঁদের মধ্যে ১১ শতাংশ তীর্থ পর্যটক। আর ভারতবাসীদের মধ্যে যাঁরা পর্যটন করেন তাদের ৬০ শতাংশই হলেন তীর্থযাত্রী। পর্যটন মন্ত্রক সূত্রের তথ্য অনুসারে ২০২১ সালে ১৪ কোটি ৩৩ লক্ষ ভারতীয় এবং ৬৪ লক্ষ ৪০ হাজার বিদেশি এখানে তীর্থ পর্যটন করেছেন। দর্শন ছাড়াও অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন মঠ-মন্দির এবং অন্যান্য তীর্থস্থলে। কেনাকাটা করেছেন হস্তশিল্প তথা কুটীর শিল্পের নানা দ্রব্য সামগ্রী। এই সূত্রে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে পর্যটনের মাধ্যমে সরকারের ঘরে মোট যে প্রায় ১৯ লক্ষ কোটি টাকার মতো এসেছে তার মধ্যে তীর্থ পর্যটন থেকে এসেছে ১১ লক্ষ কোটিরও বেশি। অর্থাৎ মোট পর্যটনের প্রায় ৬০ শতাংশ। এছাড়া মঠ-মন্দির পরিচালনকারীদের নিজস্ব তহবিলে এসেছে প্রায় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি টাকা। এর বাইরে ছোট-খাটো ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষরা যে অর্থ উপার্জন করেছেন তার সঠিক তথ্য পাওয়া দুষ্কর। তবে অনুমান করতে পারা যায় যে তার পরিমাণও নেহাত কম নয়।

এদেশে এমন অনেক ধর্মীয় সংস্থা আছে যারা অনেক নামকরা চিকিৎসাকেন্দ্র এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ তৈরি করেছে। যেমন তামিলনাড়ুর ভেলোরে হিন্দু মিশন হসপিটাল। প্রায় ১৩০ বছর আগে ১৮৯৪ সালে এর প্রতিষ্ঠা করে 'হিন্দু মিশন সোসাইটি'। এখন দেশ বিদেশের অনেকে কঠিন ও দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা করাতে ভেলোরে যান। মহর্ষি দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত আর্য সমাজ ভারতে অনেক চিকিৎসাকেন্দ্র এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করছে অতি উঁচু মানের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল এবং অন্যান্য সেবাকেন্দ্র। পুষ্করের দিলওয়ারা মন্দির-সহ জৈন মন্দিরগুলো তো প্রথাগতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়-সহ অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাঠাগার চালিয়ে থাকে। স্বামী প্রণবানন্দজী প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘও তাদের সীমিত ক্ষমতায় অনেক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুলেছে। খুব কম খরচে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে। শিখদের গুরুদ্বারাগুলো দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিনা খরচে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে। এসব মূলত সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হলেও এখানে যথেষ্ট সংখ্যক কর্মসংস্থান তথা উপার্জনের সংস্থান রয়েছে। ব্যক্তি মালিকানাধীন এবং মুনাফাখোর প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই কম। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা দরকার যে হিন্দুদের পূজাপার্বণ, উৎসবাদি বিশেষ করে নবরাত্রি, দুর্গাপুজা, গণেশ চতুর্থী, দীপাবলী, রাখিবন্ধন ইত্যাদি পালন করা হয় বলে হিন্দু ছাড়াও এদেশের বহু মুসলমানও অর্থ উপার্জন করতে পারেন। জরি ও বাজি তৈরির কাজ বেশিরভাগ করে থাকেন মুসলমানরা। গুজরাটের সৌরাষ্ট্রে জরির কাজ যেমন বেশি হয় তেমনি হায়দরাবাদে বেশি হয় মোতি তথা পুতির কাজ। বেশিরভাগ বাজি তৈরি হয়ে থাকে তালিমনাড়ুর চেন্নাই সংলগ্ন এলাকা। মঠ-মন্দিরাদি ধর্মস্থানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধর্মের কত মানুষ যে কত রকমভাবে অর্থ উপার্জন করে থাকে তার সীমা-পরিসীমা নেই।

রামজন্মভূমি মন্দির পুনর্নির্মাণকে কেন্দ্র করে অযোধ্যার কলেবরের প্রায় আমূল পরিবর্তন হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথের সরকার ছোট-বড়ো মিলিয়ে প্রায় ৩০ হাজার উন্নয়ন প্রকল্প নিয়েছে। ওই ধর্মনগরীকে কেন্দ্র করে যত রাস্তা আছে তার সবগুলোকে যেমন চওড়া করা হচ্ছে তেমনি তৈরি করা হচ্ছে নতুন নতুন সড়ক। নির্মাণ করা হচ্ছে প্রচুর হোটেল-রেস্তোরাঁ। আগে যেসব পথ দিয়ে মোটর বাইকে যেতে অসুবিধা হতো এখন তার বেশ কয়েকটা তৈরি হয়েছে ৬ লেনের। সংস্কার করা হয়েছে সরযূ নদী। ওই নদীপথে অযোধ্যায় যাতায়াতের জন্য গৃহীত হয়েছে নদীপথ যোজনা। নির্মাণ করা হয়েছে নতুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। নতুন নতুন যাত্রী নিবাস। হকার্স-কর্নার এবং আরো অনেক কিছু। উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্দোলনের চাপে রামজন্মভূমি মন্দিরের তালা খুলে যাবার পর থেকে খোদ অযোধ্যার সাধারণ ও দরিদ্র মুসলিমরা মন্দিরের পক্ষে সায় দিয়ে আসছেন। কারণ তখন থেকে শুরু করে রামলালার পূজার জন্য ফুলমালা থেকে আরম্ভ করে নানাবিধ উপাচার বিক্রি করে তাঁদের অর্থ উপার্জন হচ্ছে। তাঁদের অনেকেরই আর্থিক অনটনের অন্ধকার সংসারে আলোর রশ্মি ফুটেছে। হাসি ফুটেছে হতদরিদ্র মানুষগুলোর মুখে। রামলালার বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর সে আলো যে আরও অনেক উজ্জ্বল হবে, সেই হাসি যে আরও অনেক চওড়া হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কালক্রমে ৫ মণ্ডপের বিশাল ও সুরম্য মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে ওই তীর্থক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে যে বিপুল সংখ্যক তীর্থ পর্যটক এবং অর্থাগম হতে পারে তা খুব সহজেই অনুমেয়। একে 'সোনা ফলা' ছাড়া আর কী বলা যায়? □

মহার্ঘ ভাতার বঞ্চনা

নতুন পে কমিশন অর্থাৎ ষষ্ঠ পে কমিশন রোপা-২০১৯-র পর থেকে মহার্ঘ ভাতা নিয়ে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের তীব্র ক্ষোভ রয়েছে। ধীরে ধীরে পাওনা মহার্ঘ ভাতা নিয়ে জোরদার আন্দোলন শুরু হয়। এই বিক্ষোভ কর্মসূচি দু'ভাবে হচ্ছে। একদিকে কর্মচারীদের যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ। চাকরি প্রার্থীদের মতো তাঁরা লাগাতার ধর্না থেকে শুরু করে নানা বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ গ্রহণ করছেন। এমনকী আন্দোলন করতে গিয়ে তাঁরা জেল খেটেছেন। এখন তারা জামিনে মুক্ত। সেই মামলার এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। অন্যদিকে আর একদল সরকারি কর্মচারী ইউনিটি ফোরামের পক্ষ থেকে আইনের উপর ভরসা রেখে আইনি লড়াই করছেন। ইউনিটি ফোরামের আহ্বায়ক দেবপ্রসাদ হালদার এমনটাই জানিয়েছেন। স্যাট থেকে হাইকোর্ট, হাইকোর্ট থেকে আবার স্যাট। ফের স্যাট থেকে হাইকোর্ট হয়ে এখন সুপ্রিমকোর্টে মামলা। দীর্ঘদিন ধরে সুপ্রিমকোর্টে পেন্ডিং হয়ে পড়ে আছে। সুপ্রিমকোর্ট তারিখের পর তারিখ দিয়ে সুপ্রিম নজির সৃষ্টি করেছেন। ২০২২ সাল থেকে ওই মামলা চলছে দীর্ঘসূত্রিতার পথ ধরে।

এখন জানবো হাইকোর্টের কী আদেশ আছে। ৩১.০৮.২০১৮ ডিভিশন বেঞ্চে বিচারপতি দেবাশিস করগুপ্ত এবং বিচারপতি শেখর ববি সরাফের আদেশ 'D.A. is a legally enforceable right.' ২০.০৫.২০২২ ডিভিশন বেঞ্চে বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন এবং বিচারপতি রবীন্দ্রনাথ সামন্তের আদেশ 'D.A. is statutory and fundamental right'।

এখন জানতে হবে কেন মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হয়? CSO (Central Statistical Office) এই স্বশাসিত কেন্দ্রীয় সংস্থা বাজার দর বা AICPI মূল্যায়ন করে কেন্দ্রের কাছে মহার্ঘ ভাতার সুপারিশ করে। তারপর কেন্দ্র সরকার তাঁর কর্মচারীদের জন্যে মহার্ঘ ভাতা ঘোষণা করে এবং রাজ্যগুলোও সেই সুপারিশ মেনে ধাপে ধাপে মহার্ঘ ভাতা ঘোষণা করে। কিন্তু আমাদের রাজ্য ওই কেন্দ্রীয় সংস্থার সুপারিশ গ্রাহ্য করে না, হাইকোর্টের আদেশ মানে না। সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে কর্মচারীদের মৌলিক অধিকারকে লঙ্ঘন করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, পে কমিশনে নাকি মহার্ঘ ভাতার সুপারিশ নেই, তাই তিনি দিতে পারছেন না। কিন্তু তিনি মহার্ঘ ভাতা দিচ্ছেন ৩ + ৩ + ৪। সবশুদ্ধ ১০ শতাংশ কিন্তু কর্মচারী হাতে পেয়েছেন মাত্র ৭ শতাংশ কারণ আগের পে কমিশনের হাউস রেন্ট ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১২ শতাংশ করেছে।

এই সরকারের উদ্দেশ্য সরকারি কর্মচারীদের কীভাবে তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায়। সরকারি কর্মচারীরা হচ্ছেন সরকারের মুখ। তাঁরাই সরকারের উন্নয়নের পরিকাঠামো রূপায়ণ করেন। সরকারি কর্মচারীরা প্রথম শ্রেণীর করদাতা। তাঁরা মহার্ঘ ভাতা হাতে পেলে বাজার আরও বেশি চাঙ্গা হবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ দুর্নীতিপরায়ণ নেতাদের মতো আইন ভেঙে তাঁরা টাকা হোর্ডিং করে রাখতে পারেন না। তাই তাঁদের টাকা বাজারে যত বেশি রোলিং হবে বাজার তত বেশি চাঙ্গা হবে। সরকার কেন মহার্ঘ ভাতা দিতে পারছে না? সরকারের কোষাগারে নাকি টাকা নেই। কিন্তু সরকারের খেলা-মেলা-উৎসব ভাতা থেকে শুরু করে পূজা কার্নিভাল কোথাও টাকার ঘাটতি দেখছি না। ভাতা দেওয়ার বহর দেখে মনে হয় শুধু ভাতা দেবার জন্যে সরকার এসেছে। অর্থনৈতিক মন্দা নেই। শুধু কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা নেই। এতো শুধু কর্মচারীদের কথা যাঁরা চাকরিতে কর্মরত রয়েছেন কিন্তু যাঁরা চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন? যাঁরা ফ্যামিলি পেনশনের উপর নির্ভর করে কোনোমতে কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন? তাঁরা কিন্তু সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পান না। তাঁদের কথা সরকার কি একবার ভেবেছে? সরকারি কর্মচারীদের প্রাপ্য মহার্ঘ ভাতা দিয়ে সরকার ন্যায় বিচার ঘোষণা করুক।

—**সুবল সরদার,**
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

কুচক্রীরা ভারতকে উত্তর-দক্ষিণে বিভাজন করছে

দেশের বহু মানুষের বিশ্বাস, যখন কেউ কারও সঙ্গে লড়তে পারে না তখন সে হিংসা করে। সাম্প্রতিক চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয়ে এবং বিজেপির বিপুল জয়ে কংগ্রেস সমেত ইন্ডি জোটের দলের নেত্রীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাই তারা বিজেপিকে যারা ভোট দিয়েছে তাদেরকেই নানা ভাবে গালমন্দ করছে।

কংগ্রেস রাজস্থান, ছত্রিশগড় ও মধ্যপ্রদেশে লজ্জাজনক ভাবে বিজেপির কাছে পরাস্ত হয়েছে। সেই জন্যই তেলেঙ্গানার কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি বিহারের ডিএনএ খারাপ বলে বিহারের হিন্দি ভাষীদের চরম অপমান করেন। হতাশায় এসব বলছে। তা বলে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ও তেজস্বী যাদব চুপ কেন সেটাই আজ লাখ টাকার প্রশ্ন। ভোটের লোভে, জোটের ভাবনায় তারা মুখে কুলুপ আঁটলেও বিহারের মানুষ চরম অপমানিত বোধ করছেন। তারা ফুঁসছেন।

ডিএমকে-র দয়ানিধি মারান বিহারের মানুষজনকে চরম অপমান করে বলেন, 'বিহারিরা ছোটো খাটো কাজের জন্য এসে দক্ষিণ ভারতের যত্র তত্র মল মূত্র ত্যাগ করে নোংরা করছে। মারান আরও বলে, 'কাজ তো করে ওরা শৌচালয় সাফাইয়ের'। বুঝতে পারছি না কী স্পর্ধায় এই উক্তি ডিএমকে নেতা দয়ানিধী মারান করেন? কীভাবে এই কথা বলতে পারেন? যে বিহার স্বাধীনতা আন্দোলনে অনেক বলিদান দিয়েছে, দিয়েছে লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণকে। তাদের মধ্যে অন্যতম, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি। বাবু জগজীবন রাম শুধু দলিত নেতা নন, তিনি ছিলেন একজন সফল জাতীয় নেতা। এসব জানা সত্ত্বেও রেবন্ত রেড্ডি ও দয়ানিধিরা নিশ্চয়ই কোনো বড়ো

চক্রান্তের জন্যই এই ধরনের উক্তি করেছেন।

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র যে নাকি ওই রাজ্যের মন্ত্রী সে হিন্দুধর্মকে করোনা ও কুষ্ঠ রোগের সঙ্গে তুলনা করে তাদের নির্মূল করার নিদান দিয়েছে। দেশের ১০০ কোটি হিন্দু সমাজের মানুষকে অপমান করেছে। ইন্ডি-জোটের টিএমসি, কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, আম আদমি পার্টি, সিপিআইএম, লালু প্রসাদ ও নীতীশ কুমারের দলও সব কিছু জেনেও কোনো প্রতিবাদ করেননি। সিপিআইএম ও তৃণমূল খুব বাক্যবাগীশ। তাদের অনেক টনটনে জ্ঞান। নূপুর শর্মার বেলায় এরাই ট্রেন জ্বালিয়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ করেছিল। সেটা ছিল ইসলামি পয়গম্বরকে নিয়ে, তাই আন্দোলনের এতো উত্তাপ ছিল। হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে বলে, বিহারিদের ডিএনএ নিয়ে বলায় ওরা এতো উদাসীন কেন? মুসলমানদের মতো হিন্দুরা ব্লক ভোটার নয় বলে? বার বার হিন্দুদের দুর্বল করার জন্য হিন্দুদের বিভাজনের চক্রান্ত এরাই করে। এসব হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র। এতো নোংরা উক্তি করার পরও ইন্ডিজোটের মুখ বন্ধ এই জন্যই যে এই জোট ওখান থেকেই যা কিছু আসন পেতে পারে। বাকি জায়গায় দাঁত ফোটানো মুশকিল। এবার হিন্দুত্বের জাগরণ এসেছে। হিন্দুরা প্রতিবাদ ছেড়ে এবার প্রতিরোধের রাস্তায় নেমেছে। মানুষ জানে, রাজনীতিতে ভালো কাজ করতে শুদ্ধ আত্মার দরকার। যা ওদের নেই। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রাকে ইন্ডিভোটের বাকি কুশীলবরা হাস্যকর করে ভারতকে উত্তর-দক্ষিণে বিভাজনের চক্রান্ত শুরু করেছে।

—**শ্যামল কুমার হাতি,**
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

মোবাইল ফোনের ব্যবহার

আধুনিক ইলেকট্রনিক উন্নত সভ্যতার সবচেয়ে বেশি ব্যবহারযোগ্য বস্তু হলো মোবাইল ফোন। যেটা গোটা বিশ্বকে আজ মানুষের হাতের কাছে এনে দিয়েছে। ডিজিটালের যুগে এই মোবাইল ফোনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ১৯৭৩ সালে আমেরিকান এক ইঞ্জিনিয়ার মার্টিন কুপার প্রথম মোবাইল ফোন তৈরি করেন এবং মোটোরোলা কোম্পানির হাত ধরে মোবাইল ফোন প্রথম বাজারে আসে। আজকের দিনের মতো তখনকার মোবাইল ফোন ছিল না। সেটা ছিল কী প্যাড সিস্টেম ও আকারেও বড়ো। ১৯৯৫ সালে বাজারে স্মার্ট ফোন প্রথম আসে। তখন মোবাইল ফোনের ব্যবহার খুব সীমিত ছিল। আজ থেকে বিশ ত্রিশ বছর আগেও মোবাইল ফোনের ব্যবহার সেইভাবে চালু হয়নি। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে মোবাইল ফোনের ব্যবহার অত্যধিক হারে বেড়ে গিয়েছে। এখন জিও কোম্পানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অন্যান্য ফোন কোম্পানিগুলি আনলিমিটেড কল ও ডেটা প্যাক দেওয়ার জন্য মোবাইল ফোন ব্যবহার আগের তুলনায় অনেক সহজলভ্য হয়েছে। তাই আট থেকে আশি সবার হাতেই মোবাইল ফোন। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা গবেষণায় বলেছেন মোবাইল ফোনে অনেকটা সময় কথা বললে মস্তিস্কের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। ফলে মস্তিষ্কে ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে। এছাড়া কানে কম শোনা, মাথার যন্ত্রণা ইত্যাদি হতে পারে। অ্যান্ড্রয়েড ফোনের রেডিয়েশন থেকেও আমাদের শরীরের নানা রোগ হতে পারে। মোবাইল ফোন অতিরিক্ত ব্যবহার করার ফলে স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়, ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনায় অমনোযোগী হয়ে পড়ে। তবুও আমরা একটা দুধের বাচ্চার হাতে ফোন ধরিয়ে দিচ্ছি। মোবাইল ফোনের হেড ফোন কানে নিয়ে রাস্তা পেরোবার সময় বহু তরুণ-তরুণীর অকালমৃত্যু ঘটছে। এই মোবাইল ফোনের জন্য বর্তমানে কত মানুষ ব্ল্যাকমেলের শিকার হচ্ছে। একদিকে যেমন বেড়েছে ধর্ষণ, খুনের মতো ঘটনা, অন্যদিকে অবৈধ সম্পর্ক ও বেড়েছে। একটু অসতর্ক হলেই বেডরুম থেকে স্নান ঘরের ছবি ক্যামেরা বন্দি হয়ে সোশ্যাল সাইটে আপলোড হয়ে যাচ্ছে। নিজেদের বাড়ির মেয়ে বউদের মান ইজ্জত কিছুই থাকছে না। এমনকী কেউ কেউ মানসম্মানের ভয়ে আত্মহত্যার মতো ঘটনা ঘটাচ্ছেন। বর্তমানে কিশোর-কিশোরীদের হাতে মোবাইল ফোন যথেচ্ছভাবে ব্যবহার হচ্ছে। এই বয়সের ছেলে-মেয়েরা সারাক্ষণ সোশ্যাল মিডিয়ায় নানারকম বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। ইনস্টাগ্রামে বিভিন্ন নোংরা ছবি আপলোড করে টাকা উপার্জন করছেন। ফলে সমাজের অবক্ষয় দ্রুত হচ্ছে। যুবসমাজ বিপথে চালিত হচ্ছে। ফেসবুকের মাধ্যমে হয়তো মানুষ চেনা অচেনা বহু মানুষকে বন্ধু হিসেবে পাচ্ছেন। কিন্তু এখানেও যেসব ছবি পোস্ট করা হয় তার বেশিরভাগটাই কুরুচিকর।

সম্প্রতি নানা প্রাণঘাতী গেম মোবাইল ফোনের মাধ্যমে খেলা যায়। যেমন --- ব্লুহোয়েল, মোমো অনেক ছেলে-মেয়ের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। কোথাও কোথাও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে গুজব রটানোর কারণে হিংসা, অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হয়। মোবাইল ফোন বর্তমান যুগের একটা মূল্যবান বস্তু। এর মাধ্যমে ডিজিটাল পেমেন্ট, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য সবকিছুই একনিমিষে পাওয়া যায়। কিন্তু শিশুবয়স থেকে মোবাইল ফোন হাতে দিলে একদিকে যেমন স্মৃতি শক্তি নষ্ট হবে অন্যদিকে বিপথগামীও হতে পারে। তাই মোবাইল ফোনের অসদব্যবহারের জন্য সামাজিক অবক্ষয় চরম সীমায় পৌঁছে যাচ্ছে। মোবাইল ফোনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এখনই করা উচিত। তা না হলে সামাজিক অবক্ষয়ের সঙ্গে যুব সমাজের ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে। নিজেদের ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ রক্ষা করতে হলে বাবা মাকে আগে মোবাইল ফোনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সরকারি ভাবে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হলে খুবই ভালো, নচেৎ সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। মোবাইল ফোন বর্তমানে মানুষের অতিপ্রয়োজনীয় বস্তু কিন্তু তার সদব্যবহার করতে হবে। সভ্য সমাজের মানুষের কাছে মোবাইলের অসৎ, অসতর্ক, অতিরিক্ত ব্যবহার সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুস্থ মানসিকতা, সৎ চরিত্র গঠনের পথে অন্তরায় মোবাইল। অতএব মানুষ এর ব্যবহার প্রয়োজন অনুসারে করবে এই আশা করি।

—**চিত্তরঞ্জন মান্না,**
চন্দ্রকোণারোড, পশ্চিম মেদিনীপুর।

সমস্যার আগেই আইনগতভাবে সতর্ক হন

অরুণা মুখোপাধ্যায়

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের উপর আইনজীবনের অভিজ্ঞতায় একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি যে, যেমন অল্প শারীরিক অসুস্থতার কারণকে তাচ্ছিল্য করলে ভবিষ্যতে অনেক ক্ষেত্রেই এই তাচ্ছিল্যই শারীরিক অসুস্থতার যে গুরুতর কারণ হয়ে থাকে। ঠিক তেমনি ভাবেই পারিবারিক জীবনে সামান্য সমস্যাও ভবিষ্যতে বিরাট আকার ধারণ করতে পারে যদি সেই সমস্যাকে তাচ্ছিল্য করে আইনগতভাবে মানুষ সতর্ক না হন।

> **বর্তমান যুগে 'রেজিস্ট্রেশন' বিয়ের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বাধ্যতামূলক বলে যেন সকলেরই মনে থাকে। এই ব্যাপারে কোনও পক্ষের উদাসীনতা, আলস্য ও রেজিস্ট্রেশনে অনিচ্ছা ইত্যাদি বিপদের কারণ বলে জানবেন, কারণ পরবর্তীকালে এটি সাংঘাতিকভাবে আইনঘটিত সমস্যা রূপে দেখা দিতে পারে।**

বহু মক্কেল আমার চেম্বারে এসে আক্ষেপ করে বলেছেন যে তাঁরা প্রথমেই সতর্ক না হয়ে আইনগত পদক্ষেপ নেননি বলেই বর্তমানে এই দুর্ভাগ্য ঘটেছে।

যেমন কারোর মন্তব্য, প্রথমেই স্ত্রীকে ভালোবেসে সম্পত্তিগত আয় ও আমার নামে লিখিত বাড়ির ঘরের কথা সবই জানিয়েছিলাম। যেহেতু সে আমার সহধর্মিণী, অগ্নিসাক্ষী করা স্ত্রী; তার মা-বাবাকেও নিছক ভালমানুষই দেখেছি— অবস্থা ভালো নয় বলে আমার মায়ের গয়নার ভল্টেই তার সব গয়না রাখিয়েছিলাম যেহেতু বাড়িতে রাখা নিরাপদ নয় বলে। এখন দেখছি আমার শাশুড়িই দূর থেকে আমার স্ত্রীকে রিমোট কন্ট্রোল করছেন এবং স্ত্রীও মারমুখী হয়ে সব সম্পত্তি তার নামে লিখে দিতে বলছে এবং ভল্ট থেকে তার নিজের গহনার নামে আমার মায়ের গয়নাও সরিয়ে ফেলেছে। এই অবস্থায় আইনগত উপদেশ দিতে গিয়ে আমি জানিয়েছিলাম— ''স্ত্রীকে ভালোবাসা আপনার নিশ্চয়ই কর্তব্য; কিন্তু সেই ভালবাসায় আপনার নির্বুদ্ধিতা ছিল বলেই এই পরিণতি। ভালোবাসার অভিনয়ে আপনার অন্তরের সব খবরই যখন আপনার স্ত্রী তার শুভাকাঙ্ক্ষী মায়ের পরামর্শে জেনে নিয়েছিল আর আপনি নির্বোধের কাজ করেছেন তখন বর্তমানে মিথ্যা অত্যাচারের কারণকে ভিত্তি করে আপনাকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৮ ক ধারায় জেলের কয়েদি করার সম্ভাবনা রয়েছে।

সুতরাং পূর্বের আইনগত সতর্কতার বিষয়ে আপনার এই পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল যে স্থানীয় থানায় ডায়েরি করা স্ত্রীর মিথ্যা হয়রানি ও জোরজুলুমের ভিত্তিতে। পারিবারিক সম্মান রক্ষা করতে গিয়েই তাঁর এই বিপদের কারণ ঘটেছে বলে জানালাম। এছাড়া চেম্বারে দেখেছি বহু লোক আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন অসৎ মানুষের চক্রে পড়ে, যারা তাঁদের সরলতা ও নির্বুদ্ধিতার সুযোগ নিয়েছেন। যেমন ওই অসৎ চক্র ফোটো কপি (photo copy) না নিয়ে অরিজিনাল কপি (original copy) দলিল ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাগজ দুর্বুদ্ধিতার অভিপ্রায়ে সরিয়ে ফেলেছেন এবং পরবর্তীকালে সাদা কাগজে তাঁদের জাল সইও ধরা পড়েছে।

এই ধরনের ভুল কাজ বা অসতর্ক হওয়া প্রধানত মক্কেলরাই করে থাকেন। সুতরাং প্রবীণা ও অভিজ্ঞা আইনজীবী রূপে আমি এই পরামর্শটি দেব যে 'সব কাজ ভাবিয়া করিও— করিয়া ভাবিও না।'

বর্তমান যুগে বিয়ের ক্ষেত্রে 'রেজিস্ট্রেশন' বিশেষভাবে বাধ্যতামূলক বলে যেন সকলেরই মনে থাকে। এই ব্যাপারে কোনও পক্ষের উদাসীনতা, আলস্য ও রেজিস্ট্রেশনে অনিচ্ছা ইত্যাদি বিপদের কারণ বলে জানবেন। কারণ পরবর্তীকালে এটি সাংঘাতিকভাবে আইনঘটিত সমস্যা রূপে দেখা দিতে পারে। অনেক সময় সম্পত্তির ক্ষেত্রেও মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের সম্পত্তিতে নাম মিউটেশন (Mutation) না করানোর জন্য এবং সময়মতো কর (tax) না দেওয়ার জন্যও আইনঘটিত সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই বিষয়ে সমস্যা ঘনীভূত হওয়ার আগেই অভিজ্ঞ, সৎ ব্যক্তির শরণাপন্ন হবেন। এক্ষেত্রে আইনজীবীদেরও বিশেষ ভূমিকা আছে। মৃত ব্যক্তির আইনবিরুদ্ধ ওয়ারিশরাও সম্পত্তির লোভে জাল উইল বা অন্যান্য ভাবেও আইনি ওয়ারিশদের উপর দিয়ে নিজেরা অসৎভাবে সম্পত্তি করায়ত্ত করার জন্য আগ্রহী হয়ে পদক্ষেপ নেন। এর বিরুদ্ধেও আইনগতভাবে সতর্ক থাকবেন সামান্য সংবাদ কর্ণগোচর হওয়া মাত্র। অভিজ্ঞ আইনজীবী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদেরও এই বিষয়ে ভূমিকা আছে। □

করোনার সাম্প্রতিক সাব ভ্যারিয়েন্ট থেকে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই : ডাঃ অরিন্দম বিশ্বাস

করোনার আতঙ্ক এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি গোটা ভারতবাসী। সঙ্গে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ। আবারো সেই আতঙ্ক গ্রাস করছে আপামর ভারতবাসীকে। সেই ভয় প্রাসঙ্গিক বা ভয় একেবারেই পাওয়া উচিত নয়, স্বস্তিকার প্রতিনিধি স্বপন দাসকে জানালেন, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অরিন্দম বিশ্বাস।

হয়তো একটু আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে সবার মনে। কেননা একটা ভয়ংকর কালো সময় আমরা চাক্ষুষ করেছি। অনুভব করেছি এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের। প্রতিনিয়ত মৃত্যুর পরোয়ানা যেন তাড়া

করে ফিরেছে প্রতিটি পরিবারে। সেই কালো সময়কে আমরা পেরিয়েছি অবলীলায়। সেই অন্ধকারকে আলোয় ভরিয়েছে আমাদের সবাকার লড়াই। আজ আমরা সবাই কিন্তু আর ভয় পাই না এই করোনা নামক বিষয়টাকে। তাই প্রথমেই বলি ভয় পাবার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। কেননা করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট আমাদের সেই ভাবে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এমনটাই মত বিশেষজ্ঞদের। আমরাও যতটা জেনেছি, এই ভ্যারিয়েন্ট থেকে আতঙ্কিত হবার কোনো কারণ নেই। সামান্য চিকিৎসাতেই সেরে যাবে এই উপসর্গ নিয়ে থাকা রোগটা। আর এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলি, করোনা আমাদের থেকে কোনো দিনই দূরে থাকবে না বা আমাদের ছেড়ে যাবে না। তবে আর অতটা মারাত্মকও আকার আর নেবে না করোনা।

এবার আসা যাক মূল বিষয়ের প্রসঙ্গে, করোনার নতুন যে বিষয়টা সামনে এসেছে, সেটি একটি সাব-ভ্যারিয়েন্টের। নাম হচ্ছে, কোভিড-১৯ 'JN.1'। মাত্র কিছুদিন আগে এটির দেখা মিলেছে, চিহ্নিত হয়েছে ইউরোপের কয়েকটি দেশে। আমেরিকাতে একটি করোনা ভ্যারিয়েন্ট আছে, সেটি পিরোলা। এই পিরোলারই একটি ভ্যারিয়েন্ট হচ্ছে এই 'JN.1'। প্রাথমিক ভাবে তিন চার মাস আগে ল্যাক্সেম্বার্গে এটি চিহ্নিত হয়, তারপর ভারতের কেরালায় ও বিভিন্ন জায়গায় এটির খোঁজ মেলে রোগীর শরীরে। যদিও দেখা যাচ্ছে এটি সামান্য হলেও ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসকরা দেখেছেন যে এটি মারাত্মক নয়, আক্রমণাত্মকও নয়। তবে মৃদু উপসর্গ আছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, এই জে এন ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে কোনো মৃত্যুর খবর এখনও সেই মতো পাওয়া যায়নি। উপসর্গ হিসেবে আক্রান্তের গা-হাত-পা ব্যথা, সর্দি-কাশি ও সামান্য জ্বর দেখা যাচ্ছে। আমাদের মতে এটি এখন একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে। টেস্ট বাড়ানো দরকার। আর দেখা দরকার, আমাদের শরীরে এটা কতটা ছাপ ফেলেছে।

এই ভাইরাসের থেকে রক্ষা করার জন্য বা প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য, সেই মাস্ক, সেই দূরত্ব বিধি আবার যতটা সম্ভব মেনে চলতে হবে। এটা কোভিড পরবর্তী সময়ে আমাদের জীবনের অ্যতম প্রধান পালনীয় করে তোলা বলে আমি মনে করি। আর অনেকেই আমাকে বলছেন বা জিজ্ঞেস করছেন, আবার কি লক-ডাউন হবে? আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, সেই পরিস্থিতি এখনও আসেনি বা আসতে অনেক দেরি আছে। একটা টিপস অবশ্য আছে আমার কাছে, জনসমাগম যতটা পারবেন এড়িয়ে চলুন।

আবার বলি, মাস্ক একমাত্র পারে এই ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে। সঙ্গে করোনা বিধি পালন। ফিরে আসি সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া কিছু দুঃখজনক মৃত্যুর ঘটনায় দেখবেন, এই ভাইরাস সংক্রমণে কিন্তু সেই মৃত্যুগুলি ঘটেনি। অন্য কোনও আনুষঙ্গিক রোগের কারণে সেই মৃত্যুগুলি ঘটেছে। ফলে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। আর এই ভাইরাস কিন্তু মারণ ভাইরাস নয়। আমাদের কীভাবে রক্ষা করব তা আগেই বলেছি। একেবারে নিজেকে প্রতিরোধী করে তোলার জন্য, বছর বছর আমাদের নিজেদের ভ্যাকসিন নিতে হবে। আর এভাবেই প্রতিরোধের একটি বলয় নিজের শরীরের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। এই বলয় আমাদের রক্ষা করবে সমস্ত এই ধরনের সংক্রমণ থেকে। মনে রাখতে হবে, যদি আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে তাহলে কিন্তু বুস্টার ডোজ নিতেই হবে। এটা বাধ্যতামূলক করতে হবে সেক্ষেত্রে।

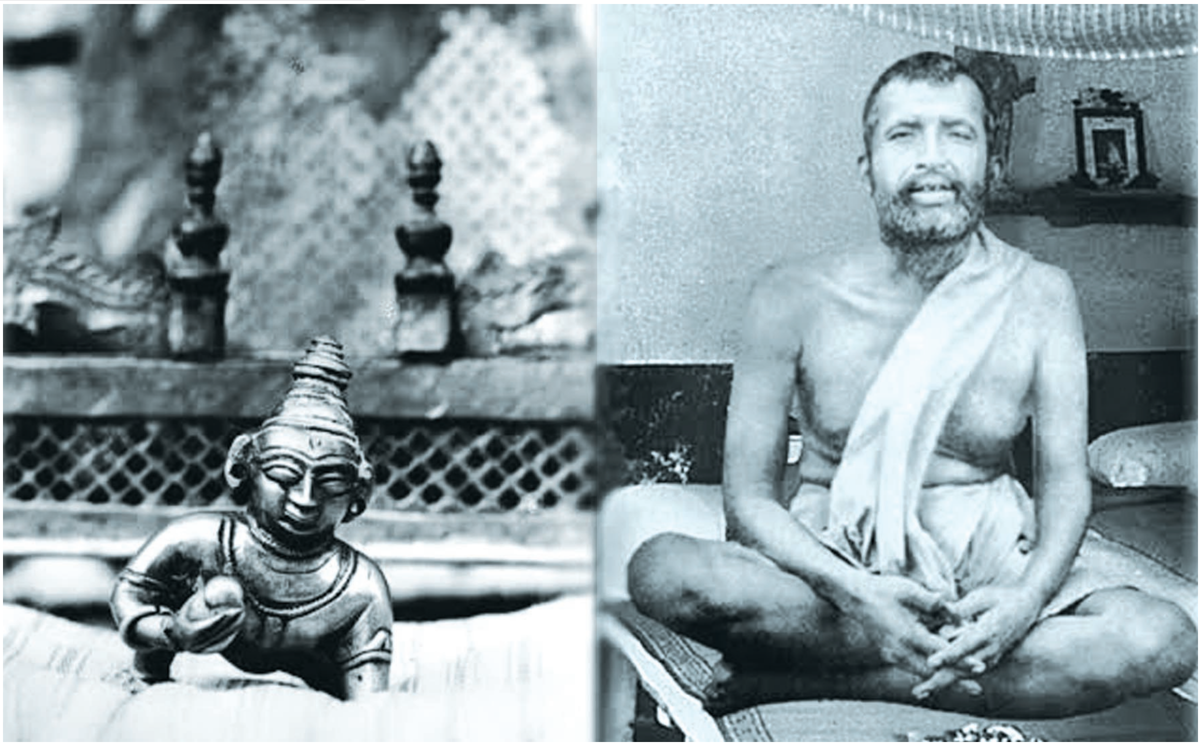

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পূজিত রামলালা।

শ্রীরামচন্দ্রকে কীভাবে দেখতেন শ্রীরামকৃষ্ণ, পার্ষদ ও শিষ্যরা

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরাম এক গ্রীষ্মের দুপুরে দূর গ্রামে গেছেন। ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত। পথে বড়ো গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়লেন। দেখলেন বিচিত্র স্বপ্ন। এক শ্যামলা বালক সঙ্গে যেতে চায়। ক্ষুদিরামের তখন নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। কিন্তু এ যে শ্যামলসুন্দর। এ যে বালক রঘুবীর! দেবসেবার সামর্থ্য কোথায়! বালক বলে, যেভাবে রাখবে, সেভাবেই থাকবে। ঘুম ভেঙে গেল তাঁর।

স্বপ্ন নির্দেশে পাশের ধানক্ষেতে গেলেন। মাটির ঢিপি, পাশে শালগ্রামশিলা। তারও পাশে উদ্যতফণা সাপ। তিনি যেতেই সাপ সরে যায়। আনন্দে মাথায় তুলে নেন শিলাখণ্ড। চিনতে ভুল হয় না তাঁর। এ যে রঘুবীর শিলা! এই রঘুবীরই হয়ে উঠলেন আদরের রামলালা, শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহদেবতা।

শ্রীরামকৃষ্ণের পিতামহ মানিকরামেরও দিন কাটতো রঘুবীরের সেবায়। পিতা ক্ষুদিরাম রঘুবীরের পুজো না করে জলস্পর্শ করতেন না। বাসভূমি 'দেড়ে' গ্রাম ছেড়ে জমিদারের অত্যাচারে যখন কামারপুকুর আসতে হলো, তখন প্রায় কর্মহীন ক্ষুদিরামের দিনের বেশিরভাগ সময় কাটতো আরাধ্য রঘুবীরকে নিয়ে। শ্রীরামই তখন তাঁর একমাত্র শান্তি, প্রাণের আরাম।

মানিকরাম-সহ শ্রীরামকৃষ্ণের বংশের বহু মানুষের নামের মধ্যে 'রাম' কথাটি যুক্ত। মানিকরামের বড়ো ছেলে গদাধরের পিতা 'ক্ষুদিরাম'। মানিকরামের অন্য দুই ছেলে 'নিধিরাম', 'কানাইরাম', মেয়ের নাম 'রামশিলা'। রামকৃষ্ণের বড়োভাই 'রামকুমার', মেজোভাই 'রামেশ্বর'। কানাইরামের বড়ো ছেলে 'রামতারক'। রামশীলার বড়ো ছেলে 'রামচাঁদ'। রামশীলার দৌহিত্র ও দৌহিত্রীর নাম 'রাঘব', 'রামরতন', 'হৃদয়রাম', 'রাজারাম'।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা রাসমণির ঘরেও ছিল রঘুবীর। একবার গ্রীষ্মে এসে হাজির এক অপরিচিত সন্ন্যাসী। তাঁর স্বামী রাজচন্দ্রের সাক্ষাৎ চান। পীড়াপীড়ি করছেন দেউড়িতে, অবশেষে অনুমতি পেলেন দারোয়ানের। দোতালায় গেলেন সন্ন্যাসী রাজচন্দ্রের কাছে, "আমার কাছে রঘুনাথজিউ শিলা আছেন। আপনাকে দেবো। আপনি সেবা করবেন। আপনার মঙ্গল হবে। আমি বহুদূর তীর্থদর্শনে যাবো; ফিরবো কিনা সন্দেহ!" তা প্রতিষ্ঠিত হলো রাসমণির ঠাকুরঘরে। রাজচন্দ্র পাশে রুপোর

হনুমান মূর্তি গড়ে দিলেন। মাহিষ্য জমিদার পরিবারে কুলদেবতা হলেন রঘুনাথজিউ।

শ্রীরামকৃষ্ণের দাদা রামকুমার কেন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের সেবাকাজের ভার পেলেন? বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে নানান কারণের মধ্যে অন্যতম হলো দুজনেই রঘুবীরের উপাসক, এক আশ্চর্য সমাপাতন। রাসমণি কি চাননি শ্রীরাম ঘরানার কোনো পুরোহিতই আদ্যাশক্তির ভার নিন! রাম যোদ্ধা, ক্ষত্রিয় বীর। মা-কালী অসুর-দলনী। দেশপ্রেমী জমিদার গিন্নীর নেপথ্য ভাবনা কি ছিল না বঙ্গভূমিতে বীর সাধনার পীঠ তৈরি হোক! সমন্বয় হোক শ্রীরাম- মা কালীর!

শ্রীরামকৃষ্ণ জটাধারী রামাইত সাধুর কাছ থেকে রামলালা পেয়েছিলেন। অষ্টধাতুর শৈশবমূর্তি। ১২৭০ বঙ্গাব্দ। রামলালাই হলো তাঁর ধ্যানজ্ঞান। শিশুমূর্তিতে প্রেমাকুল তিনি। অনুভূতি হলো, জ্যোতির্ময় শ্যামবর্ণ শ্রীরাম নিত্য পুজো নিচ্ছেন তাঁর। রামাইত সাধু রামপূজন করেন, করেন সাধন-ভজন-আরাধন। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখছেন। মন চাইলো, মায়ের স্নেহে রামলালাকে তিনি সেবা করেন। আগ্রহ দেখে সাধু রামলালার মন্ত্র দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ রামের অনুসারী হলেন। অবশেষে আবির্ভূত হলেন দশরথ তনয় রঘুপতিরাম। সাধনায় হলেন সিদ্ধ। দিব্যলীলা দেখে সেই সাধু শ্রীরামকৃষ্ণকেই দিয়ে গেলেন বিগ্রহ। এক উপযুক্ত উত্তরাধিকার।

রামলালা ও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন স্বামী অখণ্ডানন্দজী। ‘স্মৃতি-কথা’য় তিনি উল্লেখ করেছেন, একবার শ্রীরামকৃষ্ণ বাগবাজারে বলরাম ভবনে এসেছেন। সেদিন তাঁর অবস্থা সম্পূর্ণ অন্তর্মুখীন। দু-চারটে কথা বলছেন আর ভাবস্থ হয়ে যাচ্ছেন। সেই অবস্থায় তিনি রামলালার কথা তুললেন। কেমন করে রামলালাকে স্নান করাতেন, রামলালা কেমন দুরন্তপনা করতো ইত্যাদি রামলালার লীলা-বৃত্তান্ত বলতে লাগলেন। বললেন, একদিন খই খাওয়াতে গিয়ে একটা ধান রামলালার মুখে লেগে যায়। ‘‘যে মুখে মা কৌশল্যা কত ক্ষীর সর ননী দিতেও সঙ্কোচ বোধ করতেন, আজ আমি সেই মুখে ধান দিলাম।’’ এই বলে শ্রীরামকৃষ্ণ কাঁদতে লাগলেন এবং ভাবস্থ হয়ে গেলেন। হুঁশ আসার পর আবার রামলালার কথা, রামলালার গুণগান করতে লাগলেন। এইভাবে বহুক্ষণ রামলালার ভাবে কাটলো।

১৮৮৬ সালের ৭ জানুয়ারি, তখনও নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে ওঠেননি। কল্পতরু দিবস অতিবাহিত হয়েছে; শ্রীরামকৃষ্ণ তখন অসুস্থ। তাঁকে নরেন্দ্রনাথ বলছেন, এখন থেকে তাকে প্রত্যহ বলে দিতে হবে সেদিন সাধন ভজন কীভাবে করবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন তাঁর আদরের নরেনকে নিজের কুলদেবতা রামের ইষ্টমন্ত্র দিলেন। নরেনের শ্রীরাম ভজনা শুরু হলো। শ্রীম’র দিনলিপি উদ্ধৃত করে স্বামী প্রভানন্দ লিখেছেন সেই কথা। ১৩ জানুয়ারি শ্রীম দেখছেন, নরেন্দ্রনাথ পাগলের মতো রামনাম গাইছেন; অবশেষে ১৬ জানুয়ারি নরেনকে শ্রীরাম সন্ন্যাসীবেশে দর্শন দিলেন। আর ১৯ জানুয়ারি নরেন্দ্রনাথ-সহ নিরঞ্জন প্রমুখ সেই সন্ন্যাসী-বেশী রামের মতো রামাইত সাধুর বেশ ধারণ করলেন। নরেনের গেরুয়াবেশে মা ভুবনেশ্বরী যারপরনাই চিন্তিত হলেন।

নরেন যে সপার্ষদ সন্ন্যাসী হতে চান এবং তা ক্ষত্রিয় রামের সন্ন্যাস-বেশী রূপে তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পিতৃসত্য পালনের জন্য শ্রীরাম বনবাসী হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ক্ষাত্রধর্ম অক্ষুণ্ণই ছিল। শ্রীরামের এই অনন্য রূপের মধ্যেই রয়েছে চিরন্তন ভারতবর্ষের শাশ্বত চিন্তন; শৌর্যশালী অথচ তাপসমালী। ভারতবর্ষের তপোবনে ভারতীয় সভ্যতার অনন্য উপাচার আর নগর রাজধানে বিক্রমশালী প্রজারঞ্জন রাজা—এ দুয়ের এক অমিত মেলবন্ধন হলো শ্রীরামের সন্ন্যাসরূপ। স্বামী বিবেকানন্দ যে বীর সন্ন্যাসী হয়ে উঠেছেন তা হয়তো এই রঘুবীরেরই সাধনায়। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় শিষ্যকে কুলের ইষ্টনাম দিয়ে সেই সাধনার ধারাকে পরিপুষ্ট করেছেন, বঙ্গভূমিতে শ্রীরাম সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। বঙ্গের ধর্মীয় সংস্কৃতিতে শ্রীরামচন্দ্রকে পূজন-আরাধন যে প্রচলিত ছিল তা কবি কৃত্তিবাসের ‘শ্রীরাম পাঁচালী’-ই আমোচ্য প্রমাণ।

বীর হনুমানের প্রতি স্বামীজীর অগাধ ভক্তি ছিল। সন্ন্যাসী হবার পরেও মধ্যে মধ্যে মহাবীরের কথাপ্রসঙ্গে তিনি মাতোয়ারা হয়ে উঠতেন এবং অনেক সময় মঠে শ্রীমহাবীরের একটি প্রস্তরমূর্তি রাখবার সঙ্কল্প করতেন। স্বামীজী তাঁর প্রিয় শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে ১৮৯৯ সালে বেলুড় মঠ নির্মাণকালে একদিন বললেন, ‘দেশে শ্রীরামচন্দ্র ও মহাবীরের পূজা চালিয়ে দে দিকি।’ এখন চাই মহাত্যাগ, মহানিষ্ঠা, মহাধৈর্য এবং স্বার্থগন্ধশূন্য শুভবুদ্ধি সহায়ে মহা উদ্যম প্রকাশ করে সকল বিষয় ঠিক ঠিক জানবার জন্য উঠে পড়ে লাগা।

ছেলেবেলায় স্বামীজীর রামায়ণ গান শুনবার বড়ো ঝোঁক ছিল। একদিন রামায়ণ গানে শুনলেন--- হনুমান কলাবাগানে থাকে। অমনি এমন বিশ্বাস হলো যে, সেই রাত্রে রামায়ণ গান শুনে ঘরে আর না ফিরে

বাড়ির কাছে কোনো এক বাগানে কলাগাছতলায় অনেক রাত্রি পর্যন্ত হনুমানের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় অতিবাহিত করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, পূর্ণব্রহ্মের শক্তির অবতার কোথাও দশকলা, কোথাও বারোকলা এবং কোথাও ষোলোকলা। ষোলোকলা শক্তির অবতার যাঁতে হয়, তাঁকেই পূর্ণব্রহ্ম বলে লোকে পুজো করে— যেমন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি রামকে বলতেন বারোকলা। স্বামী অভেদানন্দ ১৯২৯ সালের ২৬ নভেম্বর দার্জিলিঙের রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ থেকে জনৈক শিষ্যকে চিঠিতে লিখছেন, নাম জপ করার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্তি চিন্তা করবে। ওই নামের অর্থ যিনি শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন—তিনিই এই যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে এসেছিলেন।

ঠাকুরের জন্মভিটা কামারপুকুরে রঘুবীর শিলা।

স্বামী অখণ্ডানন্দ ১৯৩৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর থেকে মহুলা সারগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে এক মাসের বেশি সময়ের জন্য রামায়ণকথা পরিবেশন করতে একজন কথকঠাকুরকে নিয়োগ করেছিলেন। অখণ্ডানন্দজীর চিঠিপত্র থেকে জানা যায় ১৯৩৬ সালের ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত সেই রামায়ণ পাঠ চলেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব রাম বিষয়ক বহু গান জানতেন। অখণ্ডানন্দজীর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে পাওয়া যায়, বড়বাজারের মাড়োয়ারি, বিহার-উত্তরপ্রদেশ বা রাজপুতনার ভক্তরা তাঁর ঘরে এলে তিনি হাসতে হাসতে তাদের সামনে গাইতেন,

''দিল রামকো নেহি জানা হ্যায়
তো যো জানা হ্যায় সো কেয়া রে।
দিল রামকো নেহি কিয়া
তো যো কিয়া সো কেয়া রে।''

শ্রীরামকৃষ্ণ দাশরথি রায়ের রচিত রাম বিষয়ক গানও রঙ্গ করে গাইতেন—

''আমার কি ফলের অভাব
তোরা এলি বিফল ফল যে লয়ে।
পেয়েছি যে ফল জনম সফল,
মোক্ষফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে।
শ্রীরামকল্পতরুমূলে রই,
যে ফল বাঞ্ছা করি, সে ফল প্রাপ্ত হই,
আমি ফলের কথা কই ও ফলগ্রাহক নই,
যাবো তোদের প্রতিফল যে দিয়ে।''

একবার বড়বাজারের মাড়োয়ারিরা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরে এসেছেন এবং তাঁর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে হাতে তুলসীমালা নিয়ে জপ করে যাচ্ছেন। দেখে তিনি বললেন, ''শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও সীতা যখন বনবাসে, তখন একটি পাখি জল খাচ্ছে আর 'রাম রাম রাম', 'রাম রাম রাম' জপ করছে। তাই দেখে রাম লক্ষ্মণকে বলছেন, 'লক্ষ্মণ, দেখ দেখ, জল খাচ্ছে আর ঠোঁটে বলছে রাম রাম রাম।' 'রাম' ভগবানের নাম।

ওহি রাম দশরথকা বেটা,
ওহি রাম ঘট ঘটমে লেটা।
ওহি রাম জগৎ বনায়া,
ওহি রাম সবসে নিয়ারা।''

স্বামী অখণ্ডানন্দের জীবনীতে স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন, গঙ্গাধর (স্বামী অখণ্ডানন্দের বাল্যনাম) দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শ্রীমুখের নানান কথামৃত উৎকর্ণ হয়ে পান করেন, ''কোনদিন-বা শোনেন, তিনি কীরূপে সরযূতীর-বিহারী রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের দর্শন পাইয়াছিলেন।''

স্বামী অখণ্ডানন্দজী ১৮৮৭ সালে উত্তরাখণ্ডের পথে অযোধ্যা-পুরীতে প্রায় এক পক্ষকাল অবস্থান করেছিলেন। ঘটনার পাঁচ বছর পর পুনরায় স্বামীজীর সঙ্গে উত্তরাখণ্ড হিমালয় যাত্রাকালে তিনি অযোধ্যায় উপনীত হলেন। স্বামীজীর অযোধ্যা দর্শন হয়েছিল, তাই সে যাত্রায় অযোধ্যা যাবার পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু গঙ্গাধর তথা অখণ্ডানন্দজী জেদ করেই অযোধ্যার দুটি তৃতীয় শ্রেণির টিকিট কেটে আনলেন। অযোধ্যা স্টেশনে পৌঁছে তারা একটি এক্কাগাড়িতে লক্ষ্মণঘাটের অভিমুখে মহাত্মা জানকীবর শরণজীর সুবৃহৎ মন্দিরে উপস্থিত হলেন। বাবাজীর সঙ্গে গঙ্গাধরের আগেই আলাপ হয়েছিল, তিনি তাই চিনতে পারলেন। সেখানে দুজনে রাত্রিবাস করে পরদিন সকালে সরযূ নদীতে অবগাহন করলেন। তারপর দেবদর্শন করে সন্ন্যাসী বাবাজীর সঙ্গে শাস্ত্রীয় নানান বিষয়ে আলাপ করলেন। এরপর তাঁর সঙ্গে অন্যান্য সাধু অভ্যাগতদের সঙ্গে একত্রে একই প্রসাদ ধারণ করলেন। মোহন্ত মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করার পর স্বামীজী কৃতজ্ঞতায় গঙ্গাধরকে আশীর্বাদ করলেন এবং মোহন্ত সম্পর্কে প্রশংসাবাদ করে বললেন, এরকম মহাত্মা উপস্থিত এই অযোধ্যায় আর একজন আছে কিনা জানি না। এমন অতুল ঐশ্বর্যের একমাত্র অধিকারী হয়েও রোজই আগন্তুক সাধু অভ্যাগতদের সঙ্গে একাসনে, একপ্রকার ভোজন, স্বসাম্প্রদায়িক বাহ্যসজ্জায় একান্ত আস্থাহীন, সরযূতীরবাসী বহু নীরব সাধক ও জাপাকর উপদেষ্টার আশ্রয় স্বরূপ এমন সুখী, বিজ্ঞ, ভক্ত ও জ্ঞানী মোহন্তগণই এখন চিরান্ধতমসাচ্ছন্ন ভারতের ভাগ্যাকাশ উজ্জ্বল করে রেখেছে।

হাওড়ার রামরাজাতলায় প্রাচীন রামঠাকুর।

শ্রীরামচন্দ্র ও বঙ্গ-সংস্কৃতি

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

কথাটা দারুণ বিতর্ক তৈরি করেছে। ‘জয় শ্রীরামে’র সঙ্গে বাঙ্গালির সম্পর্ক দেখতে পাননি নোবেল স্মারক পুরস্কার-প্রাপ্ত ‘ভারতরত্ন’ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেন। ‘জয় শ্রীরাম’ নাকি আক্রমণাত্মক— অন্যকে অত্যাচার করার জন্য তৈরি করা শব্দ। কথাটি কত দূর গ্রহণযোগ্য বলা কঠিন। কারণ বঙ্গদেশের সঙ্গে রামচন্দ্রের সম্পর্ক কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন। অধ্যাপক সেন কথাগুলি বলার পর প্রবল উৎসাহে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি ক্ষেত্রে অর্ধশিক্ষিত নেতা-নেত্রী থেকে সংবাদপত্রের মসীজীবী উচ্চশিক্ষিতরা ক্রোঙ্কারধ্বনি শুরু করেছেন। তাঁরা তাকিয়ে দেখার দরকার বোধ করছেন না এই ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনিটি সত্যিই অন্যকে অপর (outsider) করার ষড়যন্ত্র কিনা।

ড. অমর্ত্য সেন নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হবেন। তাঁর নামই তো কবিগুরু-প্রদত্ত! যখন তিনি লেখেন ‘রণজয়ী ক্ষত্রিয়েরা আর্যাবর্ত হইতে অরণ্যবাধা অপসারিত করিয়া পশু সম্পদের স্থলে, কৃষিসম্পদকে প্রবল করিয়া তুলিলেন’, তখন রামায়ণের যে ব্যাখ্যা, যে ‘রণজয়ী’ রামচন্দ্রকে দেখানো হলো, তিনি কি অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের তীব্র প্রতিবাদের লক্ষ্যই থেকে যাবেন? ‘উদ্বোধন’ পত্রিকার আশ্বিন ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের একটি প্রবন্ধ ‘রাম ও তাঁহার চরিত্র’ দেখলে সারা দেশে শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রকথা কেমন করে ছড়িয়ে পড়েছে তা তিনি দেখতে পেতেন। বলে রাখি লেখাটি তাঁর মাতামহ ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী বিরচিত। এই ভারত কেন, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়া রাম কাহিনির প্রতিপত্তি সম্পর্কে ক্ষিতিমোহন সেনের পূর্ণ ধারণা ছিল। তাঁর ভাষা : ‘ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ, কাম্বোডিয়া, যবদ্বীপ, বালিদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে রামায়ণের বহুবিধ রূপ পাওয়া যায়। যবদ্বীপের মন্দিরে ও লোকমধ্যে যে রামায়ণ কথা আছে তাহা ৫টি কাব্যের সঙ্গে মেলে।’ বঙ্গদেশ ভারতের পূর্ব সীমায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রামের জয়ধ্বনি এদেশকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে— তাম্রলিপ্ত বন্দর বাদ দিয়ে নিশ্চয় পৌঁছায়নি! যুক্তিবাদী মহাপণ্ডিত অধ্যাপক সেন কী বলেন?

বঙ্গদেশে রামচন্দ্র দশ অবতারের অন্যতম। একাদশ শতকে বাদাল, ধামোর হাট, নওগাঁও-রাজশাহীতে দশাবতারে রামচন্দ্র স্বাভাবিক ভাবেই আছেন। দশম শতাব্দীতে ধরমপুর দক্ষিণ দিনাজপুরে মিলেছে আরেকটি দশাবতার মূর্তি। দ্বাদশ শতাব্দীতে ভানোর রাজশাহীর দশাবতার মূর্তিও উল্লেখযোগ্য। একাদশ শতাব্দীতে সোনারং, মুন্সিগঞ্জ, ঢাকায় মিলেছে রামচন্দ্রের ধনুর্ধর অপূর্ব মূর্তি। এই মূর্তিটি পাওয়া গেছে অধ্যাপক সেনের পূর্বপুরুষদের গ্রামের কাছাকাছি। গণেশপুর, মণ্ডা, নওগাঁ-রাজশাহীতে প্রাপ্ত ত্রয়োদশ শতাব্দীর রাম-লক্ষ্মণ-সীতা মূর্তি অপূর্ব। মানুষ স্বভাবতই বিস্মরণশীল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন ‘বাঙ্গালি ইতিহাস বিস্মৃত জাতি’। রামের নামে জয়ধ্বনি বঙ্গদেশে বহিরাগত হলে এসব মূর্তি এল কী করে? গড়লেন কারা?

খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীতে ভট্টি কাব্য জনপ্রিয় হয়। কাব্যটির নাম ‘রাবণবধ’, তবে তা ভট্টি কাব্য নামেই বেশি পরিচিত ছিল। কবির পরিচয় ভালো মতো জানা যায় না। এই কাব্য বঙ্গদেশে ব্যাপক ভাবে পরিচিত ছিল। তৃতীয় শতাব্দীতে ভাসের ‘প্রতিমা নাটক’ ও ‘অভিষেক নাটক’ রামচরিত্র কেন্দ্রিক। সপ্তম শতাব্দীতে ভবভূতি লেখেন ‘মহাবীর চরিত’ আর ‘উত্তর রামচরিত’। ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গভাষীরা এই দ্বিতীয় নাটকটির প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তর রামচরিতের অংশ বিশেষ সহজ স্বচ্ছন্দ বঙ্গানুবাদ ‘সীতার বনবাস’ নামে প্রকাশ করেন। ১৮৬২-র সেই গ্রন্থ অবলম্বনে বাঙ্গালা ভাষায় কিছু রচনা ছাপা হয়। ১৮৬৫-তে উমেশচন্দ্র মিত্র এর নাট্যরূপ দেন। ১৮৬৬-তে কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন, ‘সীতার বনবাস’-নাটক। ১৮৬৮-তে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় একই গ্রন্থনির্ভর একটি গদ্য আখ্যান লেখেন। ১৮৮৮-তে গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেখেন ‘সীতার বনবাস’। সেটি বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল।

নবম শতাব্দীতে অভিনন্দ রচনা করেন ‘রামচরিত’। এখানে রাবণ বধের কামনায় দুর্গার অকাল বোধনের কথা লেখা হয়েছে। তবে পূজা দিয়েছেন সঙ্কটমোচন রামচন্দ্র। এই গ্রন্থ বঙ্গদেশে রচিত প্রাচীনতম রামায়ণ-নির্ভর নাটক। ১০ম-১১শ শতাব্দীতে সন্ধ্যাকর নন্দী

টেরাকোটায় সীতাহরণ, গুপ্তিপাড়া, হুগলী।

লিখেছিলেন 'রামচরিত'। এই রচনা রূপকধর্মী। কৈবর্ত বিদ্রোহের সময় সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর পোষক পাল রাজা রাম পালকে নায়ক করে এই কাব্য লেখেন। বিদ্রোহের সময় সাময়িক ভাবে রামপাল রাজলক্ষ্মীকে হারিয়ে ফেলেন। ঘটনাটি সীতা হরণ ও রাবণ বধের কাহিনিতে রূপান্তরিত করে আশ্চর্য দক্ষতায় লেখেন সন্ধ্যাকর নন্দী। রামকথা বঙ্গদেশে জনপ্রিয় না থাকলে ওই লেখা সম্ভব হতো না। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত কৃত্তিবাস ওঝা রামায়ণের জনপ্রিয় বঙ্গানুবাদ 'শ্রীরাম পাঁচালি' রচনা করেন। তাঁর রচনায় বহু জানা না জানা কবি ও গায়েনদের রচনা ঢুকে পড়েছিল। সামান্য কয়েকজনের নাম লিখছি। কৃষ্ণদাস রচিত 'রামনাম উপাসনা'র পুঁথি লেখা হয় ১৭১৭ শকাব্দে (১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে); পঞ্চানন চক্রবর্তী লেখেন 'রামরসায়ন', নটবর দত্ত লেখেন 'রামজন্ম পালা', অদ্ভুতাচার্যের 'অযোধ্যা-অরণ্য-আদি-উত্তরাকাণ্ডে'র বহু পুঁথি পাওয়া গেছে, অখণ্ডদাস বা অনন্তপণ্ডিত, অনন্তরাম দ্বিজের বহু রামায়ণ পালা পাওয়া গেছে। উৎসবানন্দ লিখেছিলেন, 'লবকুশ যুদ্ধ', 'সীতার বনবাস'। কংসারি পণ্ডিত, কণ্ঠমণি দাস, কণ্ঠহার দ্বিজ ছিলেন বিখ্যাত রামায়ণ গায়ক। কবিচন্দ্র দ্বিজ ছিলেন বিষ্ণুপুর রাজসভার কবি। তিনি 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' লিখেছেন সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে। কমললোচন দত্ত, কল্যাণ দে, কালিদাস, কালীকিঙ্কর দেবদাস, কালীচরণ ভট্ট, কুমুদ দত্ত, কেশব মিত্র, কৈলাস বসু, খোসাল শর্মা, গঙ্গাদাস সেন, গৌরীকান্ত, ঘনশ্যাম, চন্দ্রকিশোর দাস, জগৎবল্লভ, জগন্নাথ দাস, জয়চন্দ্র নরপতি, জীবন চক্রবর্তী, তিলকচন্দ্র আচার্য, দয়ারাম, দুর্গাচরণ দ্বিজ, দুর্লভ দ্বিজ, দুলাল দ্বিজ, দেবানন্দ দ্বিজ, দেবীদাস, দেবীনন্দন, ধনঞ্জয় দ্বিজ, ধর্মদাস, নারায়ণ দাস, নিধিরাম দ্বিজ, পঞ্চানন দ্বিজ, প্রসাদ দাস, ফকিররাম কবিভূষণ, বংশীমোহন, ব্রহ্মসুন্দর দ্বিজ, ভবানন্দ, ভবানী দাস, রামপ্রসাদ, রামমোহন, রামশঙ্কর, রামানন্দ ঘোষ, রামানন্দ যতি, রুদ্রসেন শর্মা, লক্ষ্মণ দ্বিজ, লক্ষ্মীরাম, লোকনাথ সেন, শঙ্কর, শম্ভু সুত, শিবরাম, শ্যামাচরণ খাস্তগির, শ্রীধর বানিয়া, ষষ্ঠীচরণ মজুমদার, ষষ্ঠীধর সেনগুপ্ত, সঞ্জয়, সত্যানন্দ, সম্পদ রায়, সাফল্য দ্বিজ, হটুশর্মা, হরেন্দ্র নারায়ণ মহারাজা। সবার কথা লিখলে মহাকাব্য হয়ে যাবে। এর পরও বলা হবে রামচন্দ্র বঙ্গদেশে বহিরাগত!

তিনজনের কথা লিখে প্রসঙ্গ বদলাব। জগদ্রাম রায় বঙ্গদেশে বিশেষ ধরনের রামভক্তিবাদ প্রচার করেন। তিনি দামোদরের দক্ষিণে মেজিয়ার নিকটবর্তী আধগাঁ-ভুলুই গ্রামে বাস করতেন। তিনি ও তাঁর পুত্র রামপ্রসাদ রচনা করেন 'রামায়ণ' আর 'দুর্গা পঞ্চরাত্রি' (সর্বপ্রাচীন পুঁথি ১৭৭১ খ্রি:)। রামচন্দ্রের অকাল বোধনের তাত্ত্বিক কাঠামো এই শেষোক্ত গ্রন্থে স্পষ্ট। প্রকৃত সত্য হলো কৃত্তিবাসী রামায়ণে অকালবোধন প্রসঙ্গ প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। রাম ভক্তিবাদের ব্যাপক জনপ্রিয়তার পরে এই বিষয়টি রামায়ণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকবে। জগদ্রাম রায় প্রতিষ্ঠিত দুর্গোৎসব বঙ্গের একটি ব্যতিক্রমী উৎসব।

'চন্দ্রাবতী'র রামায়ণ পাওয়া গেছে পূর্ববঙ্গে। পিতা দ্বিজ বংশী দাস। চন্দ্রাবতী মধ্যযুগের প্রথম মহিলা কবি। তাঁর রচনা ছোটো। আর এই রামায়ণটি অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের পূর্বপুরুষের বাড়ির কাছে মোটামুটি জনপ্রিয় ছিল।

ফ: ৪

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, রাজশাহীতে সংগৃহীত আছে ছাদেক আলীর রামায়ণ। 'রামচন্দ্রের বনবাস' লিখেছিলেন তিনি। এটি সংগ্রহ করেন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। পুঁথিটি অসম্পূর্ণ। ভণিতায় আছে 'শ্রীরামের বনবাস...ছাদেক আলি কহে।' কেন ছাদেক আলি রামায়ণ কথা লিখলেন? আসলে বঙ্গদেশে মুসলমানরা প্রথমদিকে ওয়াহাবি বা ফরাজি ভাবাদর্শে বিশ্বাসী ছিল না। তারা দেশীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিকতাকে অস্বীকার করেনি।

কালের বিচারে পূর্ব ভারতে রামায়ণের প্রভাব পড়েছে তুলসী দাসের 'রামচরিত মানস' রচনার বহুপূর্বে। কৃত্তিবাসের 'রাম পাঁচালী' রচিত হয় দেড়শো বছর আগে। চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত তাঁর কাব্য। একই কথা অসম ও ওড়িশায়। অসমীয় ভাষায় চতুর্দশ শতাব্দীতে লেখা হয় দুর্গাবরের 'গীতরামায়ণ'। মহামাণিক্য মাধব কন্দলীর রামায়ণ--- এটিও সমসাময়িক। মহাপুরুষিয়া মতের শঙ্করদেব গদ্যে রামায়ণ অনুবাদ করেন সপ্তদশ শতাব্দীতে। তিনি 'রামবিজয় নাটক'ও রচনা করেন। শঙ্করদেবের শিষ্য মাধব দেব, তিনি রামায়ণের আদিকাণ্ড অনুবাদ করেছিলেন। ওড়িয়া ভাষায় বলরাম দাসের রামায়ণ 'জগমোহন রামায়ণ' বা 'দণ্ডী রামায়ণ' নামে পরিচিত। বিশিষ্ট ওড়িয়া সাহিত্যিক ফকিরমোহন সেনাপতি গত শতাব্দে পদ্যচ্ছন্দে সম্পূর্ণ রামায়ণ রচনা করেছেন। এর পরও পণ্ডিত আর মূর্খ এক কাতারে দাঁড়িয়ে রাজনীতির কারণে রামনামের বিরোধিতা করবেন?

বঙ্গদেশের রামভক্তিবাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায় শ্রীচৈতন্যের পরিব্রাজক জীবন কথায়। তাঁর সহপাঠী মুরারি গুপ্ত ছিলেন রামভক্ত। নিজেকে ভাবতেন হনুমান। তিনি গৌরাঙ্গকে কৃষ্ণাবতার ভেবে আত্মদ্বন্দ্বে আত্মহত্যায় উদ্যত হন। গৃহদেবতা রামকে অসম্মানও করতে পারেন না, অথচ প্রত্যক্ষ 'অভিনব হেম কল্পতরু' অবতীর্ণ কৃষ্ণকেও অসম্মান করবেন কি করে! শ্রী গৌরাঙ্গ তাঁকে গঙ্গাকূলে রামরূপে দেখা দিলেন। বললেন, ত্রেতায় তিনিই দশানন রাবণকে পরাস্ত করেছিলেন!

মুরারি দেখয়ে রঘুনাথ পরতেক।।
দূর্বাদল শ্যাম দেখে সেই বিশ্বম্ভর।
বীরাসনে বসিয়াছে মহাধনুর্ধর।।
জানকী লক্ষ্মণ দেখে বামেতে দক্ষিণে।
চৌদিকে করয়ে স্তুতি বানরেন্দ্র গণে।।

এসব রচনা বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে প্রচলিত। নাগরিক মতিচ্ছন্ন বিদেশি ভাবাদর্শের তারা ধার ধারেন

না। শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস যাত্রার সময় রামনাম নিয়েই পর্যটন শুরু করেছিলেন— সেকথা এই প্রগল্ভ সবজান্তারা কি জানেন? তিনি বলে চলেন :

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষমাম্।

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্।।

শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে পৃথক করা অন্যায়, শ্রীরামকে বঙ্গদেশে বহিরাগত বলা চরম অপরাধ।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের গৃহদেবতা রঘুবীর, একথা ভুলে যেতে হবে? তাঁর স্বহস্ত লিখিত রামায়ণ কথার পুঁথি— 'যোগাদ্যার পালা' 'সুবাহুর পালা'র কথা ভুলে যেতে হবে? ভুলে যাব সদ্য-উপবীত সংস্কার হওয়া গদাধর চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন 'মহীরাবণ পালা'? 'সুবাহুর পালা'র শেষে আছে :

শ্রী গদাধরকে বর দিবে ওহে গুণনিধি।

কল্যাণে রাখিবে রাম তোমায় নিবেদি।।

এসব কথা না জানা অজ্ঞতা। আর তাকেই উপদেশের বিষয় করা অজ্ঞানের আস্ফালন ছাড়া কী বলব?

পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তে ৩৬ টি সাল, তারিখযুক্ত রামমন্দির থাকা সত্ত্বেও রামকে বহিরাগত বলার পিছনে যুক্তি ও বিবেচনার সীমা পরিসীমা নেই।

স্থান	দেবমন্দির	সময়কাল
ঘুরিসা, বীরভূম	রঘুনাথ	১৬৩৩
রামপুর, পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া	রঘুনাথ	১৬৪০
বাঁকুড়া	রঘুনাথ	১৬৪০
দিগনগর, কৃষ্ণনগর, নদীয়া	রাঘবেশ্বর	১৬৬৯
সবরাকন, তালডাংরা, বাঁকুড়া	রামকৃষ্ণ	১৬৭৭
নলডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, যশোহর	রামেশ্বরী	১৬৯৮
রাউতাড়া, আমতা, হাওড়া	সীতারাম	১৭০০
হরিপাল, হুগলী	সীতারাম	১৭৩৬
উখরা, অণ্ডাল, বর্ধমান	সীতারাম	১৭৪০
তিলানন্দপাড়া, সবং, মেদিনীপুর	জানকী বল্লভ	১৮১১
বরাহনগর, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ	রামনাথেশ্বর	১৭৪১
কলাগাছিয়া, গোঘাট, হুগলী	রঘুনাথ	১৭৬২
পারুল, আরামবাগ, হুগলী	রঘুনাথ	১৭৬৮
উবদিপুর, খানাকুল, হুগলী	রঘুনাথ	১৭৬৮
ভালিয়া, আরামবাগ, হুগলী	রঘুনাথ	১৭৭২
মাধবপুর, আরামবাগ, হুগলী	রাম	১৭৭৯
কালনা, বর্ধমান	রামেশ্বর	১৭৮৩
ঘাটাল, মেদিনীপুর	রঘুনাথ	১৭৯৭
কাদিলপুর, দাসপুর, মেদিনীপুর	রঘুনাথ	১৭৯৯
নিমতলা, দাসপুর, মেদিনীপুর	রঘুনাথ	১৮০১
দিশপুর, ডেবরা, মেদিনীপুর	রঘুনাথ	১৮০৪
অলিঙ্গিরি, এগরা, মেদিনীপুর	রঘুনাথ	১৮১০
তিলানন্দপাড়া, সবং, মেদিনীপুর	জানকী বল্লভ	১৮১১
জনার্দনপুর, দাসপুর, মেদিনীপুর	সীতারাম	১৮১৪
পুঁড়শুঁড়া, হুগলী	রামচন্দ্র	১৭৫৩
মেদিনীপুর	রামচন্দ্র	১৮১৭
মেদিনীপুর	রঘুনাথ	১৮৩৭
চিরুলা, এগরা, মেদিনীপুর	রামচন্দ্র	১৮৪৩
রাধাকান্তপুর, দাসপুর, মেদিনীপুর	রঘুনাথ	১৮৪৬
সাতক্ষীরা, খুলনা	রামসীতা	১৮৫১
বলরামপুর, ডেবরা, মেদিনীপুর	সীতারাম	১৯৬০-৬১
খারার, ঘাটাল, মেদিনীপুর	সীতারাম	১৮৬৪
মেদিনীপুর	রঘুনাথ	১৮৬৭
মেদিনীপুর	সীতারাম	১৮৬৯
হুগলী	রঘুনাথ	১৮৭২-৭৬
আনন্দপুর, কেশপুর, মেদিনীপুর	রঘুনাথ	১৮৯৩

পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তে ৩৬ টি সাল, তারিখযুক্ত রামমন্দির থাকা সত্ত্বেও রামকে বহিরাগত বলার পিছনে যুক্তি ও বিবেচনার সীমা পরিসীমা নেই। বাঙ্গালির নামে রাম-সীতার অভাব নেই। জনমদুখিনী সীতার নাম দেবার প্রবণতা একটু কম, তা থেকেও বোঝা যায় রামায়ণ আমাদের কতখানি প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ-সংস্কৃতির দ্বারা স্নাত ছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল 'রামায়ণ' ঘরের কথাকে বড়ো করে তুলে ধরেছে। কৃত্তিবাসের রাম 'ভক্তবৎসল রাম'। শুধু কি তাই, বহু কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ভাবনা রাম-নির্ভর। 'বাল্মীকি প্রতিভা' নাটকে রামায়ণ কথা প্রত্যক্ষ। 'রক্তকরবী'র কাহিনি ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, যক্ষপুরীর রাজা 'এক দেহে রাবণ ও বিভীষণ'।

শেষ করব বর্ধমান জেলার দক্ষিণ দামোদরের কৃষ্ণপুর গ্রামবাসী ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর ভণিতায় পাওয়া একটি পুঁথির কথা বলে। এক দুপুরে কবি বসে আছেন। এক অসাধারণ সুদর্শন যুবক এলেন। জানতে চাইলেন জগন্নাথের পুরী কোন দিকে? ঘনরাম দেখিয়ে দিলেন। তারপর এক অপূর্ব সুন্দরী গৃহবধূ এলেন। তিনিও একই প্রশ্ন করলেন। ঘনরাম পুরুষোত্তম তীর্থের পথ দেখিয়ে অপার্থিব এই দিব্য সৌন্দর্যে ঘনরামের মন পবিত্রভাবে বিহ্বল হলো। আবার এক স্বর্ণাভ রূপবান যুবক এলেন— একই প্রশ্ন করলেন। যন্ত্রবৎ ঘনরাম দেখালেন জগন্নাথের পথ। এবার এক হনুমান এলে— ঘনরাম তাকে দেখে প্রশ্ন করলেন, আপনি নিশ্চয় বজ্রাঙ্গবলী রামভক্ত হনুমান। স্মিত হাসলেন হনুমান— কেন? সামনে যাঁরা গেলেন তাঁরা নিশ্চয় শ্রীরাম— সীতা আর শ্রী লক্ষ্মণ! হায় হায় করতে থাকলেন তিনি। হনুমান তাঁকে মৃদু তিরস্কার করে চলে গেলেন। আজকের পশ্চিমবঙ্গে রামচন্দ্র সম্পর্কে যাঁরা অজ্ঞতা প্রকাশ করছেন তাঁদের জন্য এই রূপক-কাহিনিটি হয়তো কোনো অন্য অর্থ ও তাৎপর্য বহন করবে। ■

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের রাষ্ট্রীয় অধিবেশন

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (ABVP) ৬৯ তম রাষ্ট্রীয় অধিবেশন গত ৭ থেকে ১৩ ডিসেম্বর সম্পন্ন হলো দেশের জাতীয় রাজধানী দিল্লি শহরে। ইন্দ্রপ্রস্থ নগরীর বুরাড়ী ময়দানে দেশের সাংগঠনিক ৪৪টি প্রান্ত থেকে ১০ হাজার প্রতিনিধি অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধিদের থাকার জন্য পুরো ময়দান ১২টি নগরে বিভক্ত করা হয়েছিল। এক-একটি নগরের নামকরণ হয়েছিল দেশের এক-একজন মহাপুরুষের নামে। অধিবেশনের শুভারম্ভ হয় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের রাষ্ট্রীয় সভাপতি বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর রাজশরণ শাহি এবং রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক যাজ্ঞবল্ক্য শুক্লার হাতে সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ মুকুন্দজী, অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর, অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য সুরেশ সোনী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবিভিপি-র পূর্বতন কার্যকর্তা তথা বর্তমানে ইন্ডিয়া টিভির প্রধান সঞ্চালক রজত শর্মা।

অধিবেশন স্থলেই এক কেন্দ্রীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। তাতে সারা দেশের প্রতিটি রাজ্যের সাংস্কৃতিক দিকটিকে চিত্রায়ণ করা হয়েছিল। মাটি ও বালির তৈরি কলাকৃত্য সকলের নজর কাড়ে। অধিবেশনে উত্তরবঙ্গ থেকে ৮৫ জন এবং দক্ষিণবঙ্গ থেকে ২৩১ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের উদ্যোগে নদীয়ায় তুলসীপূজার আয়োজন

দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের উদ্যোগে গত ২৫ ডিসেম্বর নদীয়া জেলার বীরনগরের সন্নিকটে জয়পুর গ্রামে তুলসীপূজার আয়োজন করা হয়। তুলসীপূজাকে কেন্দ্র করে সারা গ্রামে উৎসাহের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। দশজন গরিব মানুষকে কম্বল দান করা হয়। অনুষ্ঠানে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন গ্রামের পরিমল মোদক, মোহন্ত শর্মা, রবীন বিশ্বাস, নিতাই মোদক, হারান খামারিয়া, নীলা মোদক এবং উর্মিলা খামারিয়া। মূল উদ্যোক্তা ছিলেন মিলন খামারিয়া। শেষে সবাইকে পরমান্ন ও ফল প্রসাদ হিসেবে দেওয়া হয়।

রিষড়া প্রেম মন্দিরে গঙ্গাপূজা ও আরতি

গত ২৬ ডিসেম্বর হুগলী জেলার রিষড়া প্রেম মন্দিরে দ্বারকাপীঠাধীশ অনন্তশ্রী বিভূষিত পরমপূজ্যপাদ জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য স্বামী সদানন্দজী সরস্বতী মহারাজের উপস্থিতিতে গঙ্গামাতার পূজন ও আরতি অনুষ্ঠিত হয়।

প্রেম মন্দির প্রাঙ্গণে সহস্রাধিক ভক্ত সমাগমে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য মহারাজজী সনাতন ধর্ম-সংস্কৃতি রক্ষা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনে তা মেনে চলার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রবচন দান করেন।

অনুষ্ঠানে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রবীণ সন্ন্যাসী ও প্রখর বক্তা স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, মহানাম সেবক সঙ্ঘের শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী-সহ বহু পূজ্য সন্ত মহাত্মারা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত, পূর্বক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সম্পাদক স্বপন মুখোপাধ্যায় এবং দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক মানিক পাল উপস্থিত ছিলেন।

সমগ্র অনুষ্ঠান বৈদিক রীতি অনুসারে সঞ্চালনা করেন রিষড়া প্রেম মন্দির আশ্রমের সম্পাদক তথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের মার্গদর্শক মণ্ডলীর সম্পাদক পূজ্যপাদ শ্রীমৎ নির্গুণানন্দজী ব্রহ্মচারী।

সক্ষমের উদ্যোগে শিলিগুড়িতে তুলসী আরাধনা

গত ২৫ ডিসেম্বর সক্ষম শিলিগুড়ি জেলা সমিতির উদ্যাগে এনজেপি রেলস্টেশনের সন্নিকটে শান্তিপাড়ার হরিমন্দির প্রাঙ্গণে তুলসীপূজন দিবস উদ্‌যাপিত হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গরত্ন প্রাপক টেবিল টেনিস কোচ ভারতী ঘোষ এবং ভারতীয় ক্রিকেটের জাতীয় দলের নবনির্বাচিত খেলোয়াড় মুন্না সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি থেকে নির্বাচিত সাংসদ ড. জয়ন্ত কুমার রায়, সেবা ভারতীর উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক সুনীল শা, কোষাধ্যক্ষ দীনেশ আগরওয়াল, অখিল ভারতীয় লঘু উদ্যোগ ভারতীর সম্পাদক প্রবীণ আগরওয়াল, শিলিগুড়ির ক্রীড়া ভারতীর সম্পাদক সৌভিক শর্মা এবং সক্ষম উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক চন্দন রায়। অনুষ্ঠানে একজন দিব্যাঙ্গ ভাই এবং একজন দিব্যাঙ্গ বোনকে হুইল চেয়ার প্রদান করা হয়।

গত ২৫ ডিসেম্বর ভারতের পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিনে কলকাতায় ন্যাশনাল লাইব্রেরির ভাষা ভবনে অটলবিহারী বাজপেয়ী জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'অটলজী স্মৃতি স্মারক সম্মান' প্রদান করছেন পূজ্য সমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী মহারাজ।

With Best Compliments from-

A Well Wisher

মালদাবাসীর মনের মণিকোঠায় রয়েছেন

সাধক বঙ্কটবাবা

প্রবীর কুমার রায়

মালদা জেলায় কালিয়াচক একটি পরিচিত নাম। কালিয়াচক থানা তৈরির আগে ব্রিটিশ ভারতে বিস্তীর্ণ কালিয়াচক নিয়ন্ত্রিত হতো পঞ্চানন্দপুর থেকে যা আজ গঙ্গাগর্ভে। কালিয়াচক ১, ২, ৩ নামে তিনটি ব্লক থাকলেও কালিয়াচক বলতে মালদাবাসী কালিয়াচক-১ ব্লকের সীমানাকে বোঝেন। যার বিধানসভা সুজাপুর। আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গ কেন গ্রামীণ ভারতবর্ষের মধ্যে সবথেকে ঘনবসতিপূর্ণ এই কালিয়াচক এলাকা। কালিয়াচককে দেখে ভ্রম হতে পারে এটি কী সত্যি পঞ্চায়েত নাকি পৌরসভা? কালিয়াচকের ভৌগোলিক গঠন বেশ বৈচিত্র্যময়। এর ১০ থেকে ১২ কিলোমিটার আগে শ্মশানী, চরিঅনন্তপুর, মহব্বতপুর গ্রামগুলি ভারতের সীমান্ত এলাকায় রয়েছে কাঁটাতারের বেড়া ও সীমান্ত রোড। মহব্বতপুরে কাঁটাতারের ওপারে ৭৮ নম্বর পিলারটি এখনো দেখা যায়। ২০ কিলোমিটার উত্তরে সাবেক মালদা শহর। ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে ফরাক্কা ব্যারেজ, গঙ্গানদী, এনটিপিসি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং পশ্চিমে গঙ্গানদীর বিশাল জলরাশি। কালিয়াচক থেকে ২ কিলোমিটার পশ্চিমে মোথাবাড়ি যাওয়ার রাস্তায় রেললাইন পার হয়ে সড়কের বাম ধারে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম সিলামপুর। এই গ্রামে আনুমানিক ১৫০ বছর আগে বসবাস শুরু করেন ঈশ্বরের বরপ্রাপ্ত এক যোগী পুরুষ। তিনি ছিলেন অকৃতদার। সাধন ভজনই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। যোগী পুরুষের কুটিরে ছিল সাধারণ মানুষের অবাধ যাতায়াত। সেই সময় গ্রামীণ ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত ছিল না, তবুও দিন যত যায় তাঁর আশীর্বাদ লাভের জন্য লোকের ভিড় বাড়তে থাকে। তিনি ক্রমান্বয়ে সাধনার উচ্চতরে উন্নীত হন। স্থানীয় মানুষের কাছে তিনি সাধক নামে পরিচিত হন। সাধকের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কোনো দক্ষিণা, নিয়ম-নীতি কোনো কিছুর বালাই ছিল না। কালিয়াচক ও সন্নিহিত অঞ্চলে বসবাস করে বিপুল সংখ্যক মুসলমান সম্প্রদায়। তারাও সাধককে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। সেই সময় ব্যবসা ছিল নদীনির্ভর এবং গঙ্গার তীববর্তী পঞ্চানন্দপুর ছিল প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। পঞ্চানন্দপুরে অবাঙ্গালি বিশেষ করে মাড়োয়ারি বণিক সম্প্রদায়ের বসবাস গড়ে ওঠে। পঞ্চানন্দপুরের কাছে গঙ্গার ধারে সাহেবগঞ্জে (ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ জেলা নয়) ছিল ইংরেজ সাহেবদের বসবাস ও নীলকুঠি। কালিয়াচক, সিলামপুরের লোকের চাষবাসের সঙ্গে মুখ্য জীবিকা ছিল পলুপোকা পালন অর্থাৎ রেশম চাষ। সেই সময় কালিয়াচকে রেশম গুটি থেকে রেশম তৈরির কারখানা গড়ে উঠলেও ব্রিটিশ সাহেবদের বৃহৎ আকারের রেশম কারখানা ছিল মহানন্দা নদীর তীরবর্তী বার্লো স্কুলের পেছনে লোকড়ীখানা লেনে। রেশমগুটি সোনালি রেশম সুতোয় পরিণত হয়ে পঞ্চানন্দপুর দিয়ে জলপথে বিদেশে রপ্তানি হতো। সেই সময় বিজ্ঞান উন্নত ছিল না, তাই পলুপোকার মড়ক দেখা দিলে চাষিরা মড়ক থেকে নিস্তার পাওয়ার আশায় সাধকের কাছে আসতেন। জনশ্রুতি, তিনি মন্ত্রপূত মাটি তাদের পলুর ডালায় ছিটিয়ে দিতে বলতেন। তার ফলে মড়ক বন্ধ হয়ে যেত। এই ভাবে বিভিন্ন অসুখ থেকে নিস্তার পেতে এবং ব্যবসায় মন্দা দেখা দিলে বণিক শ্রেণীর আনাগোনা বাড়তে থাকে। তিনি কখনো তাদের মাথার চুল বা মাটি দিয়ে ফেরত পাঠাতেন। এইভাবে ব্যবসার উন্নতি ঘটলে বণিক মহলে সাধকের মাহাত্ম্য ব্যাপক বৃদ্ধি পায়।

সেই সময় সাধকের আশীর্বাদে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। জনশ্রুতি অনুযায়ী ঘটনাপ্রবাহ এরকম : বর্তমান কালিয়াচক-২ ব্লকের যুগলতারা একটি

সাধারণ গ্রাম। চাষবাসই ছিল মানুষের প্রধান জীবিকা। গ্রামে অন্য সকলের সঙ্গে বসবাস করত দুই ভাই জগন্নাথ ও মাধবযাদবের পরিবার। তাদের পূর্বপুরুষ গঙ্গনদীর ওপার থেকে এসেছিলেন, তাই নামের শেষে পদবি ঘোষের পরিবর্তে যাদব। তাদের জীবিকা ছিল গোপালন এবং দুধ-দই বিক্রি করা। এর মূল উপভোক্তা ছিল সাহেবগঞ্জের নীলকুঠির ইংরেজ সাহেবরা, তাদের দেশীয় বাবুরা, পঞ্চানন্দপুরের মাড়োয়ারি সম্প্রদায় এবং কালিয়াচকের কিছু ব্যবসায়ী এবং সিলামপুরের সাধক। দুধ-দই সুষম আহার, ওসব সিদ্ধপুরুষের আদর্শ খাবার। সেই সময় সাধকের অলৌকিক ক্ষমতার দীপশিখা বিচ্ছুরিত হতে থাকে। বড়ো ভাই জগন্নাথ ছিলেন সেই সময়ের আলোকে অনেকটা দূরদর্শী। তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যত কষ্ট হোক সাধকের কাছে দুধের মূল্য কোনোদিন নেবেন না এবং নিজেরা এসে নিষ্ঠার সঙ্গে দুধ, দই দিয়ে যাবেন। তাছাড়া সাধক পয়সা পাবে কোথা থেকে এবং এটাই তাদের সাধকের প্রতি ছিল অর্ঘ্য। আসল কথা হলো সাধকের অলৌকিক ক্ষমতা তারা খুব কাছ থেকে টের পেয়েছিলেন।

সেই সময় সাহেবগঞ্জের কুঠি, রেশমের সোনালি সুতো, লবণ, সুতির জামাকাপড় এবং অন্যান্য ব্যবসাকে কেন্দ্র করে পঞ্চানন্দপুর হয়ে উঠেছিল একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। সেখানে তৎকালীন সাহেব কুঠিতে তর্জা, যাত্রাগান, বাইজিনাচ লেগেই থাকতো। এইরকম এক সকালে এলাকাবাসীর ঘুম ভাঙলো ঢাকির ঢক্কা নিনাদে। ঘোষণা শোনা গেল, সাহেবগঞ্জের কুঠিতে দই খাওয়ার প্রতিযোগিতা হবে। এখানে রাজশাহি ডিভিশন ও ইংরেজবাজার শহরের সাহেবরা উপস্থিত থাকবেন। যাদব ভাইয়েরা সাধককে দুধ দিতে এসে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন। সাধক তাদের মাটির সরার পরিবর্তে ঝাঁঝরে (তলায় অসংখ্য ফুটো করা মাটির সরা) দই জমাতে বললেন। তারা পড়লেন মহাবিপদে। ঝাঁঝরে দই জমানো কীভাবে সম্ভব। দুধতো ফুটো দিয়ে পড়ে যাবে। কিন্তু সাধকের কথা বিফলে গেল না, তারা ঝাঁঝরে জমানো দই নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিযোগিতায় জমা করলেন। ঝাঁঝরে জমানো দই যা স্বাদে গুণে অনন্য, একি কোনো দৈব ঘটনা যা দেখে ইংরেজ সাহেবরা চমকে গেলেন এবং তাদের দই প্রতিযোগিতায় প্রথম হলো। সাধক যে সাধারণ মানুষ নন তা আবার প্রকাশ পেল। প্রথম পুরস্কার স্বরূপ কী নেবেন তা ইংরেজ সাহেব জিজ্ঞাসা করলে যাদব ভ্রাতৃদ্বয় সাহেবের কাছে সরকারি জমি দান হিসেবে চাইলেন। পঞ্চানন্দপুরের সাহেবগঞ্জ মৌজাতে ৩০০ বিঘা জমি পুরস্কার স্বরূপ তাঁরা পেলেন।

এইভাবে যুগলতলার যাদব পরিবারের কাছে সাধক হয়ে উঠলেন তাঁদের কুলদেবতা। সাধকের অকুণ্ঠ আশীর্বাদে যাদব পরিবারের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগলো। সাধকের কথামতো তারা অবিভক্ত ভারতের পুরো ভাতিয়া বিল কিনে নিলেন। দেশভাগের সময় এর মাত্র ৩০ শতাংশ ভারতে পড়ে। ভারত সরকারের জমিদারি বিলোপ আইন অনুযায়ী বর্তমান মালিক পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এইভাবে যাদব পরিবার প্রায় ৩ হাজার একর জমির মালিকে পরিণত হয়। শোনা যায় ঢোল সহরত করে জমির মজুর সংগ্রহ করা হতো। এইভাবে চাষবাস হয়ে ওঠে মুখ্য জীবিকা। সাধকের আশীর্বাদে যাদব জমিদার বাড়িতে কালীপূজার প্রচলন হয় যা ১০০ বছর পেরিয়ে এখনো মহা ধুমধামে হয়ে চলেছে। বড়ো ভাই জগন্নাথ বুঝেছিলেন সম্পত্তি টিকিয়ে রাখতে হলে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে আইনি শিক্ষার খুব প্রয়োজন। তাই তাঁর মধ্যমপুত্র হয়েছিলেন মালদার স্বনামধন্য আইনজ্ঞ ঈশ্বরলাল ঘোষ। কনিষ্ঠপুত্র নরেশবাবু উকিল হয়ে নিজেদের সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন। তিনি শহরের হোস্টেলে রেখে তার পুত্রদের উচ্চশিক্ষিত এবং এক মেয়েকে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পড়ান। সেই সময় গ্রামে নারীশিক্ষার প্রচলন ছিল না, তখন মেয়েদের ডাক্তারি পড়ানোর কথা ভাবলে গা শিউরে ওঠে। বর্তমানে এদের পরিবার শহরের সিঙ্গাতলায় বসবাস করে। বড়ো পুত্র কানাইলাল গ্রামে থেকে যান। মাধববাবুর দুই পুত্র সুরেশ ও দেবেশ। তাদের সন্তানাদিও বর্তমানে মালদা শহরের বাসিন্দা।

কালের নিয়মে সাধক একদিন ইহলীলা সংবরণ করেন। সেই সময়ের বিভিন্ন গল্প প্রচলিত আছে। অনেকে বলেন দেহত্যাগের দিন সাধককে সাহেবগঞ্জ ঘাটে, কেউ বলেন রাজমহল ঘাটে নৌকা পার হয়ে বর্তমান ঝাড়খণ্ডের দিকে যেতে দেখেছেন। আজ থেকে প্রায় ১২৫ বছর আগে মালদাবাসী হারিয়েছে সেই সাধক মহামানবকে। কথিত, সাধক বলে গিয়েছিলেন তাঁর পার্থিব শরীর যেন গঙ্গার ধারে দাহ না করে তার পুণ্য সাধনস্থল সিলামপুরে সমাধিস্থ করা হয় এবং মা গঙ্গা একদিন এসে তার সমাধি বিধৌত করবেন। সাধকের মৃত্যুর অনেকদিন পর সিলামপুরের সমাধিস্থলে স্থানীয় লোকের পূর্ণ সহযোগিতায় মাধব যাদবের কনিষ্ঠপুত্র দেবেশ যাদবের স্ত্রী সুভদ্রাবালা যাদব সাধকের স্মৃতিতে মন্দির নির্মাণ করেছেন এবং মন্দিরকে আরও সুন্দর করার লক্ষ্যে বর্তমান কমিটি মন্দির সংস্কারের কাজ করে চলেছে। সাধকের মাহাত্ম্যকে স্মরণ রেখে এলাকাবাসীর উদ্যোগে মহা ধুমধাম সহকারে প্রতি বছর ৯ পৌষ (তিরোধান দিবস) ৭ দিন ব্যাপী পালাকীর্তন এবং আগের দিন অর্থাৎ ৮ পৌষ বাবার স্নানাভিষেক হয়ে থাকে। এই কীর্তনে দূরদূরান্ত থেকে চাল-ডাল, টাকাপয়সা আসে, সেখানে দাতার নাম উহ্য থাকে। শঙ্করনাথ রায়ের 'ভারতের সাধক' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ না হলেও বঙ্কটবাবা যুগের পর যুগ বেঁচে থাকবেন মালদাবাসীর মনের মণিকোঠায়। □

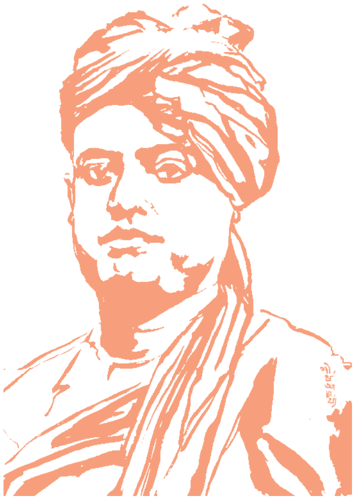

স্বাধীনতার লড়াই এবং স্বামী বিবেকানন্দ

ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি

স্বামীজীর আবির্ভাব ও তিরোভাব ব্রিটিশ ভারতে। ব্রিটিশ শক্তির ভালো গুণের সঙ্গে তাদের নির্দয় শোষণ ও অত্যাচারকে তিনি দেখেছেন। সিস্টার ক্রিস্টিনকে তাঁর রাজনৈতিক অভিলাষের কথা সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেছেন— 'বিদেশি শাসন উৎখাত করার জন্য আমি ভারতের দেশীয় রাজন্যগণের জোট ঘটাবার চেষ্টা করেছিলাম। সেই উদ্দেশ্যে আমি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত পায়ে হেঁটে ঘুরেছি, সেই কারণেই আমি রাইফেল নির্মাতা স্যার হিরাম ম্যাক্সিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম। কিন্তু দেশ থেকে কোনো সাড়া পাইনি।'

স্বামীজী জানতেন উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতীয় জাতীয়তাবোধ ছিল অস্তিত্বহীন। ভারতবাসী ছিল না তখন। ছিল মারাঠি, পঞ্জাবি, মাদ্রাজি, বাঙ্গালি ইত্যাদি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। তিনি জানতেন এই জাতি বা প্রদেশের ক্ষুদ্র বিভাজনগুলোকে সরিয়ে ভারতীয়ত্ববোধ সঞ্জাত করতে না পারলে প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই সম্ভব নয়। ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধের অন্যতম বীজটি রোপিত হয়েছিল শিকাগোর ধর্মমঞ্চকে ব্যবহার করেই। স্বামীজী আমেরিকায় গিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী কথা যে বলবেন সে সম্পর্কে রামনাদের রাজার আশঙ্কা ছিল। তাই আমেরিকা যাত্রার জন্য স্বামীজীকে দশ হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও ব্রিটিশ রোষানলে পড়ার ভয়ে এই দেশীয় রাজা সে পথ পরিহার করেছিলেন।

শক্তিমান হিসেবে তিনি ভারতীয়দের দেখতে চেয়েছিলেন। তিনি দেখেছেন দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগর কেমন করে বিধর্মী শক্তিকে হেলায় সরিয়ে আপন গৌরবে সমাসীন ছিল। 'এই দক্ষিণ দেশেই যখন উত্তর ভারতবাসী আল্লা হু আকবর, দীন্ দীন্' শব্দের সামনে ভয়ে ধনরত্ন, ঠাকুর দেবতা, স্ত্রী-পুত্র ফেলে ঝোপে জঙ্গলে লুকুচ্ছিল, (তখন) রাজচক্রবর্তী বিদ্যানগরাধিপের অচল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।'

স্বামীজী জানতেন ঐক্যবদ্ধ হিন্দু জাতি ছাড়া দেশের স্বাধীনতা সম্ভব নয়। বিজয়নগরে হিন্দুসাম্রাজ্য ও জাতীয়তাবোধ শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়েছিল। প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ভারত ছিল হিন্দুদের স্বাজাত্যবোধের ক্ষেত্র। কারণ হিসেবে স্বামীজী বলেছিলেন 'দক্ষিণাঞ্চলে শঙ্করাচার্য ও রামানুজাচার্যের অভ্যুদয়ের পরই এদেশের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে একতাবদ্ধ জাতি ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ দেশকেই মাতা বলে সম্বোধন করতেন। দেশ ছিল তাঁর মাতা কালিকা। নেতাজী সবিনয়ে বলেছিলেন যে, যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁদের মধ্যেই জাতীয়তাবোধ প্রভাব ফেলেছে। ইংরেজ কবি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্বব্যাপী জয়কে ঘোষণা করে লিখলেন—

'Rule! Britania! Rule the waves
Britania never will be slaves.'

সমুদ্রতরঙ্গকে শাসন করতে চাওয়া ব্রিটিশ রাজশক্তির দম্ভকে উপেক্ষা করে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের আদি পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ সেদিন কম্বুকণ্ঠে বলেছিলেন— 'মানুষ ঈশ্বরের প্রতিহিংসায় বিশ্বাস না করতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের প্রতিশোধকে যে কখনোই অগ্রাহ্য করতে পারবে না। ইংরেজের উপর ইতিহাসের সেই প্রতিশোধ নামবে। তারা আমাদের গলায় পা দিয়ে থেঁতলেছে, নিজেদের সুখের জন্য আমাদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত চুষে খেয়েছে, লুঠে নিয়ে গেছে আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকা আর আমাদের দেশের মানুষ সারা দেশ জুড়ে পেটে হাত দিয়ে পড়ে আছে।'

এমন অগ্নিবর্ষী কথা কখনো ব্রিটিশ ভারতে বসে বলা যায়? তাও কোন্ সময়? না দেশ তখনও স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রস্তুত নয়। মডারেট কংগ্রেসিরা কেবল দাবি ভিক্ষায় আনতশির তখন। মনে পড়ে আরও অনেক পরের ঘটনাবলীর কথা। ১৯১৯-এর জালিয়ানওয়ালাবাগ। ডায়ারের বুলেট বর্ষণ তো ব্রিটিশ ঔদ্ধত্যের প্রতীক। সে সময় আর এক বিশ্বজয়ী বাঙ্গালি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কে সেদিন উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদী হয়েছিলেন? গান্ধীজী ছিলেন রহস্যময় ভাবে নিশ্চুপ। দেশবন্ধু ব্রিটিশ রাজরোষের সম্ভাব্য তীব্রতার কথা ভেবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রতিবাদী হওয়ার সাহস দেখাননি। তখন জাতীয় আন্দোলন কিন্তু প্রবলতর ছিল। আর স্বামীজী যখন এই কথাগুলো বলেছিলেন তখন স্বাধীনতার আন্দোলন সবে মনোরাজ্যে একটু ঠাঁই পেয়েছে। কী প্রবল শক্তি, কী প্রবল দাঢ্য থাকলে তবে এক সন্ন্যাসী অকুতোভয়ে এমন অগ্নিবর্ষী উদ্দীপক বাণী শোনাতে পারেন। সাধে কী আর নেতাজী বলেছিলেন যে স্বামীজীর প্রয়াণের পর তাঁর প্রভাব আরও ব্যাপক হয়ে উঠেছিল।

মহাপ্রয়াণের পর স্বামীজীর বাণী আরও সুতীব্র, আরও বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। স্বামীজীর বাণী ও ভগবদগীতা ছিল

বিপ্লবীদের নিঃশেষে প্রাণদানের প্রেরণা। আলিপুর বোমা মামলায় বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাই হত্যাকাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত কানাইলাল ফাঁসির আগের দিন স্বামীজীর 'জ্ঞানযোগ' থেকে আলেকজান্ডার ও ভারতীয় সন্ন্যাসীর কাহিনি উচ্চকণ্ঠে পাঠ করছিলেন। জেল সুপার এমনভাবে পড়ার কারণ জানতে চাইলে অকম্পিত কানাইলাল বলেন, 'শুনতে পাচ্ছ না? বুঝতে পারছ না? আমি তো তোমাদের মাতৃভাষাতে পড়ছি, সাহেব। তোমাদেরই দেশ লন্ডনে তোমাদের দেশের মানুষকে শুনিয়েছেন আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ। শোন, শোন, এই আমাদের যন্ত্র, আমাদের বাইবেল আর তোমাদের মৃত্যু পরোয়ানা।'

নির্বীর্য জাতির বুকে এমন ক্ষাত্রতেজ আনতে পেয়েছিলেন একমাত্র তিনি। স্বামী বিবেকানন্দ। পুরুষার্থ ও শক্তির আকর যে গীতা তাই তিনি ব্যাখ্যা করলেন। তিনি কালীসাধক বলেই পেরেছিলেন এই সত্যে পৌঁছতে। মহাকাল বা শিব হলেন ধ্বংস ও সৃষ্টির দেবতা। তাঁর বুকে অবস্থান করেন মহাকালী যিনি সমস্ত কালকে কলন করে সময়ের প্রেক্ষাপটে ধ্বংস ও বরাভয় প্রদান করেন। বেদান্তের অভীঃমন্ত্র শক্তি ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বলেই স্বামীজী মৃত্যুভয়কে জয় করার গান শোনাতে পেরেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন তত্ত্ব' ও স্বামীজীর অগ্নিবর্ষী বাণীর উপর ভিত্তি করে ১৯০২-এর ২৪ মার্চ, দোল পূর্ণিমার দিন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিপ্লবী সংগঠন 'অনুশীলন সমিতি'। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র বসুর সুস্পষ্ট অভিমত, 'স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল জাগ্রত, সমুন্নত, একযোগে মুক্ত স্বাধীন ভারত।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক। তিনি বলেছিলেন শস্ত্র যদি ধারালো না হয় রাষ্ট্র তাহলে ব্যর্থ। পরাধীন। তাঁর গলায় শোনা গিয়েছিল যুগান্তের বাণী 'অহিংসা পরমোধর্মঃ/ধর্ম হিংসা তথৈবচ।' ধর্মের জন্য হিংসা অহিংসার চেয়েও গৌরবের। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্র ধারণ না করেও ধর্মরাজ্য স্থাপনে সদর্থক ভূমিকা নিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দও পরাধীন ভারতে শ্রীকৃষ্ণের মতো অদৃশ্য সুদর্শনচক্র দিয়ে ব্রিটিশ গৌরবসূর্যকে আচ্ছন্ন করেছিলেন। বিশিষ্ট বিবেকানন্দ গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু যথার্থই বলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে অবশ্যই দাবি করা যাবে তিনি আমাদের জাতীয়তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক ও প্রফেট। তিনি প্রথম আমাদের দেশ ও তার সংস্কৃতির পক্ষে বাসনার সুর তুলেছিলেন, তীব্র অনুভূতিময় সেই দেশপ্রেম, যা গত দশকের জাতীয়তাবাদী প্রচারের মধ্যে প্রধান আশ্রয় হয়ে উঠেছিল।'

স্বামীজী শুধুমাত্র বিপ্লবমন্ত্রকে ছড়িয়ে দেননি। জাতীয় ইতিহাসের ছিলেন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক। সখারাম গণেশ দেউস্কর যখন ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিদেশি শক্তির সাহায্য প্রয়োজন কিনা জানতে চান, তখন স্বামীজী আত্মশক্তির জাগরণের কথা স্মরণ করিয়ে সতর্ক করে বলেন যে ভারতবাসী চতুর্থবার আর ওই ভুল করবে না। বিষ্ণু রানাডেকে এই বিপ্লবী সন্ন্যাসী দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন যে, ভারতবাসীকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে সংঘাতপূর্ণ ধ্বংসাত্মক রূপ নিতে হবে, যাতে সিন্ধুপারের শাসকেরা নতজানু হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন চির বিদ্রোহিনী। অদম্য কেল্টিক রক্তের অধিকারিণী এই আইরিশ কন্যা ভারতে বিপ্লববাদের অন্যতম পথিকৃৎ। স্বামীজী জানতেন শাক্ত তন্ত্রের এই সাধিকা শুধুমাত্র ধর্মক্ষেত্রে বিচরণ করবেন না। স্বামীজী তাঁর প্রিয় শিষ্যাকে তাই পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন স্বপথে চলার। সে পথ বিপ্লবের। স্বাধীনতার। ব্রিটিশ রাজশক্তি বিবেকানন্দকে কেবলমাত্র গেরুয়া পরা এক সন্ন্যাসী মনে করতেন না। ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের সন্দেহের ঊর্ধ্বে ছিলেন না তিনি।

ভারতীয় বিপ্লববাদের অত্যুজ্জ্বল মুখ ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। তিনি স্বামীজী ও নিবেদিতা সম্পর্কে অত্যন্ত সশ্রদ্ধ ছিলেন। তাঁর কথায় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী হয়েও ভজন-পূজন, সাধন-আরাধনার মধ্য দিয়ে আত্মমুক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। সশস্ত্র বিপ্লব ছিল এই 'সাইক্লোনিক মঙ্ক'-এর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। নিবেদিতাকে সেই কাজে তিনি যে অনেক বেশি উৎসাহিত করেছিলেন যে বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন নিঃসন্দেহ।

যতি চিহ্ন ছোঁয়ার আগে 'মুক্তি সঙ্ঘে'র প্রতিষ্ঠাতা ও বিখ্যাত বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের নির্মল স্বীকারোক্তির কাছে একবার যাওয়া যাক— 'বিবেকানন্দই আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। যদিও সে ছিল আমার বন্ধু। আমার সহপাঠী, আমারই সমবয়সি, তবু তাকে আমার 'গুরু' বলে, আমার 'চৈতন্যদাতা' বলে ভেবে আমি গর্ব অনুভব করি। বিবেকানন্দকে আমি একজন ব্যক্তি হিসেবে দেখি না, দেখি দেশপ্রেমের একটা জ্বলন্ত অতিকায় অগ্নিশিখা রূপে, যে অগ্নিশিখা থেকে একটা স্ফুলিঙ্গ ছিটকে আমার বুকের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। ...এই ব্রহ্মবান্ধব বিবেকানন্দেরই সৃষ্টি। শুধু আমি নই, আমার মতো অনেকেই স্বামীজীর প্রভাবে নবজন্ম লাভ করেছে।'

সমাজ পর্যবেক্ষক স্বামীজী আস্থাশীল ছিলেন ভালোবাসার অমোঘ শক্তিতে। যে 'দত্ত, দম্য, দয়ধ্বম্' মন্ত্রে সংস্কারাচ্ছন্ন এ দেশে প্রাণের জাগরণ তিনি ঘটাতে চেয়েছিলেন, তাকে আত্মস্থ করে গভীর আবেগে তিনি বলেছিলেন যে, প্রেমই সব রুদ্ধ দুয়ার খুলে দেয়। এই প্রেম ও বীর্যের সাহায্যেই নিম্নস্তরে থাকা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে তিনি পৌঁছতে চেয়েছিলেন। তিনি জানতেন বিপ্লববাদের সঙ্গে নারী শক্তির জাগরণ ও হতদরিদ্র দেশবাসীর আত্মসচেতনতাই স্বাধীনতার সবচেয়ে শক্তিশালী ক্ষেত্র। স্বামীজী সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধার আর এক আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ তাই যথার্থই বলেছিলেন যে ভারতবর্ষকে জানতে হলে বিবেকানন্দকে জানা চাই। □

রামমন্দিরের পুনর্নির্মাণ ভারতীয় ইতিহাসকে কমিউনিস্ট ঐতিহাসিকদের দুষ্টচক্র থেকে উদ্ধারের পথ খুলে দিয়েছে

পিন্টু সান্যাল

রামজন্মভূমির রায়, রামমন্দির পুনরুদ্ধারের অনাবিল আনন্দের মধ্যে ভারতবাসীকে ভাবতে বাধ্য করেছে ভারতের ইতিহাসকে কমিউনিস্টদের দুষ্টচক্র থেকে উদ্ধার করলেই দেশরক্ষা সম্ভব।

দ্বিতীয় পর্ব

রামজন্মভূমি আন্দোলনে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু ছিল বিতর্কিত কাঠামোটি মন্দির ভেঙে তৈরি হয়েছিল কি না! ১৯৭৮ সালে ড: ব্রজবাসী লালের তত্ত্বাবধানে প্রত্নতত্ত্বের ছাত্র হিসেবে ড: কে কে মুহম্মদ বাবরি কাঠামোর দেওয়ালে মন্দিরের স্তম্ভের খোঁজ পান। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর হিন্দু মন্দিরের গঠনশৈলীর মতো কালো ব্যাসল্ট শিলার এই স্তম্ভগুলির নীচের দিকে হিন্দু রীতি অনুসারে আটটি শুভঙ্করী চিহ্ন অর্থাৎ 'অষ্টমঙ্গলা'র একটি প্রতীক পূর্ণকলস অঙ্কিত ছিল। ১৯৯২ সালে বিতর্কিত কাঠামোর অবলুপ্তির আগে এইরকম ১৪টি স্তম্ভ ছিল। সেই সময় আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া সেখানে প্রায় দু'মাস ধরে সার্ভে চালায়। বিতর্কিত কাঠামোর পিছনদিকে খননের পর ইটের তৈরি ভিত দেখা যায়, যার ওপর স্তম্ভগুলির নির্মাণ হয়েছিল। ১৯৯০ সালে যখন রামজন্মভূমি আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করেছে, তখন ড. কে কে মুহম্মদ বাবরি কাঠামোর নিচে মন্দিরের অস্তিত্বের কথা বলেন। এই সময় থেকেই রোমিলা থাপার, বিপান চন্দ্রের মতো কমিউনিস্ট

ঐতিহাসিকরা রামায়ণের ঐতিহাসিকতা, বাবরি কাঠামোর নীচে রামমন্দিরের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। ডি এন ঝা, ইরফান হাবিব, প্রফেসর আর এস শর্মা, সুরজ ভান এই দলে যুক্ত হন। একমাত্র সুরজ ভান প্রত্নতাত্ত্বিক আর বাকিরা ঐতিহাসিক হিসেবে পরিচিত। বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে সেই সময় ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টোরিক্যাল রিসার্চের চেয়ারম্যান ইরফান হাবিব সভাপতিত্ব করতেন। কমিউনিস্ট ঐতিহাসিদের এই দল বিভিন্ন সংবাদপত্র আর পত্রিকায় কাঠামোর নীচে মন্দিরের অস্তিত্বের বিপক্ষে লিখতে থাকেন। ফলে বিভ্রান্তি আরও বেড়ে সত্যকে স্বীকার করে রফার সম্ভাবনা ক্ষীণ হতে থাকে। ১৯৮৯ সালের নভেম্বরে জে এন ইউ-এর সেন্টার ফর হিস্টোরিক্যাল স্টাডিজ থেকে প্রকাশিত 'Babri Masjid--Ramjanmabhumi Dispute -- An Analysis by Twenty five Historians'-এর মাধ্যমে রোমিলা থাপার, বিপান চন্দ্রের মতো কমিউনিস্ট ঐতিহাসিকরা এই বিতর্কে প্রথম যোগ দেয়। সেই সময় এইসব ঐতিহাসিকরা বলতে থাকেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে রামের পূজা হতো না।

কিন্তু ঐতিহাসিক প্রমাণ ঠিক এর বিপরীত। কৌশাম্বির খননকাজে দ্বিতীয় শতাব্দীর টেরাকোটার রাবণের সীতাহরণের মূর্তি পাওয়া যায়। কাশ্মীরের ধ্বংসাবশেষ থেকে তৃতীয় শতাব্দীর সীতারাম অঙ্কিত সিলমোহর পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে শ্রীরামকথার বিভিন্ন অংশকে চিত্রিত করে মন্দিরের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে, যার মধ্যে পঞ্চম শতকে ওয়ার্ধায় দ্বিতীয় প্রভরাসেনার নির্মিত মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। চতুর্থ শতাব্দীতে মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশমে শ্রীরাম আর শ্রীহরিকে সমার্থক বলা হয়েছে।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের নির্দেশে ২০০৩ সালে খননকাজের পর মন্দিরের চূড়ার বৃত্তীয় অংশ 'আমলক', আর বিগ্রহকে অভিষিক্ত করার পর জল নির্গমনের 'মকর প্রণালি' পাওয়া যায়। খননকাজের সময় উপস্থিত ১৩১ জনের মধ্যে ৫২ জন মুসলমানকে রাখা হয়। শুধু তাই নয়, বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটির সুরজ ভান, সুপ্রিয়া বর্মা, জয়া মেনন ওই দলের মধ্যে ছিলেন।

২০১০ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট আর ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ফার্সি, উর্দু, সংস্কৃতে লেখা ঐতিহাসিক তথ্যের বিশ্লেষণ হয়েছে। এসেছে ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, জীববিদ্যা, পুরাণ ও জাতকের কথার প্রসঙ্গ। নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ হিসেবে যে সমস্ত তথাকথিত 'বিখ্যাত' ঐতিহাসিকরা সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের দাবির পক্ষে ছিলেন তারা আদালতের সামনে খননের আগে আর পরে দুবারই নিজেদের খ্যাতির প্রতি সুবিচার করতে পারেননি।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের জাস্টিস আগরওয়াল এই সমস্ত বিশেষজ্ঞদের দাবির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেন। সুপ্রিয়া বর্মা এ এস আই-এর খননকাজের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলেন, কিন্তু পরে আদালতে স্বীকার করেন মাটির নীচের পরিস্থিতি জানতে যে রাডার সার্ভে হয়েছিল, যার জন্য আদালত খননকাজের নির্দেশ দেয়, তা তিনি পড়ে দেখেননি। খননের সময় উপস্থিত না থাকলেও শ্রীমতী বর্মা ও জয়া মেনন দাবি করেন, খননকাজে পাওয়া স্তম্ভগুলি বাইরে থেকে এনে রাখা হয়েছিল।

সুবীরা জয়সওয়াল স্বীকার করেন, বিতর্কিত বাবরি কাঠামো সম্পর্কে যে রিপোর্ট তিনি দিয়েছিলেন তা খবরের কাগজ আর নিজের ইতিহাস বিভাগের মধ্যযুগীয় ইতিহাসের এক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে তৈরি করা। শ্রীমতী জয়সওয়াল স্পষ্ট করে বলেন, তিনি যে বয়ান দিয়েছেন তা তার নিজস্ব মত। নিজস্ব মতকে ইতিহাস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া ঐতিহাসিক এই দেশের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর তার সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ রামজন্মভূমি মামলা।

প্রত্নতাত্ত্বিক শিরিন রত্নাগর স্বীকার করেন, তার প্রত্নতত্ত্বের বিষয়ে কোনো ফিল্ড এক্সপিরিয়েন্স অর্থাৎ বাস্তবিক কাজের কোনো অভিজ্ঞতা নেই।

বাবরি মসজিদের পক্ষের অন্য এক সাক্ষী— প্রফেসর ডি মণ্ডল, যার বইয়ের ভূমিকা শিরিন লিখেছিলেন, তার আদালতে সাক্ষ্যদান আরও বেশি আশ্চর্যজনক। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ইতিহাস, সংস্কৃতি ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ডি মণ্ডলের 'অযোধ্যা' : আর্কিয়োলজি আফটার ডেমোলিশন' বইটি লিখেছেন অযোধ্যার বাস্তবিক পরিস্থিতি স্বচক্ষে না দেখেই। এমনকী তিনি স্বীকার করেন, বাবর সম্পর্কে তার জ্ঞান শুধুমাত্র এইটুকু যে, বাবর ষোড়শ শতাব্দীর এক মুঘল বাদশা। আদালত ডি মণ্ডলের জ্ঞানের অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে কোনো দ্বিধা করেননি, আর সাক্ষী হিসেবে তার বৈধতাকে কোর্ট বাতিল করেন— the entire opinion of this witness is short of the requirement under Section-15 of the Evidence Act 1872 to qualify as an expert.. (page 3655 para 3629).

এলাহাবাদ হাইকোর্ট মন্তব্য করে, শুধুমাত্র ড: ব্রজবাসী লালের রিপোর্ট আর ছবি দেখেই আস্ত একটা বই লিখে ফেলেছেন প্রফেসর মণ্ডল, কিন্তু নিজে থেকে সেই বিষয়ে আরও বেশি অধ্যয়নের প্রয়োজন মনে করেননি। প্রফেসর মণ্ডলের সেই বইটি এক বিখ্যাত প্রকাশনী সংস্থা থেকে এখনও প্রকাশ হচ্ছে আর অনলাইনে পাওয়া যায়। প্রফেসর মণ্ডল কোর্টে বলেন, তিনি কমিউনিস্ট পার্টির লাল কার্ডের ধারক আর তার কোনোরকম ধর্মীয় বিশ্বাস নেই।

প্রফেসর মণ্ডল তার বইয়ের ভূমিকায় রোমিলা থাপারের বক্তব্যের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন যে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, আরএসএস সর্বপ্রথম রামজন্মভূমির জায়গায় বাবরি কাঠামোর অবস্থানের প্রসঙ্গ তোলে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রামজন্মভূমি আন্দোলন অযোধ্যার রামমন্দির নিয়ে বিতর্কের শুরু হিসেবে দেখিয়ে কয়েকশো বছরের ইতিহাসকে চেপে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। ১৮৫৫ সালে আওয়াধের নবাব ও ইংরেজ আধিকারিক জেমস আউট্রামের মধ্যে যে চিঠির আদান-প্রদান হয়, সেখানে হনুমানগড়ি আর জন্মস্থানের জন্য দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষের উল্লেখ পাওয়া

যায়। সুলতানি আমল, মুঘল আমলে মন্দির ধ্বংসের উদাহরণের অভাব নেই, কারণ মূর্তিপূজা সেইসব শাসকদের উপাসনা পদ্ধতিতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে আর মূর্তিপূজকরা তাদের কাছে অপরাধী। শ্রীরামজন্মভূমির প্রতি হিন্দুদের শ্রদ্ধায় কোনোকালেই ভাটা পড়েনি। আর রামজন্মভূমিকে উদ্ধারের বিভিন্নরকম চেষ্টাও চলতে থাকে।

চারজন কমিউনিস্ট ঐতিহাসিক আর এস শর্মা, এম আতহার আলি, ডি এন ঝা এবং সুরজ ভানের লিখিত 'হিস্টোরিয়ানস রিপোর্ট টু দ্য নেশন' ১৯৯১ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়। এই আশায় যে সরকার যেন এইসমস্ত ঐতিহাসিকদের বিচারের প্রক্রিয়ার অংশ করে, যাতে ইতিহাসের বিষয়ে সঠিক তথ্য তারা তুলে ধরতে পারেন। কিন্তু হয়েছিল ঠিক উল্টো। আর বিচার প্রক্রিয়া দিনের পর দিন তাদের জন্য বিলম্বিত হয়। পরবর্তীকালে সুরজ ভান স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, বি বি লালের খননের রিপোর্ট না পড়েই মাত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যে তড়িঘড়ি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিকদের ওই দল রিপোর্ট তৈরি করে। দেশকে বিপথে চালিত করার এইরকম দুঃসাহস কোথা থেকে পেলেন তাঁরা?

আর এক মসজিদ পক্ষের সাক্ষী শিরিন মুসাভির প্রথমে বলেছিলেন, সপ্তম শতাব্দীর আগে রামের জন্মস্থান নিয়ে কোনো কিংবদন্তি প্রচলিত ছিল না, কিন্তু জেরার সময় স্বীকার করেন যে, শিখ সাহিত্যে গুরু নানকের অযোধ্যায় রামের জন্মস্থান দর্শনও পবিত্র সরযূ নদীতে স্নানের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুপ্রিম কোর্ট গুরু নানকের রামমন্দির দর্শনকে হিন্দুদের রামজন্মভূমির প্রতি শ্রদ্ধার প্রমাণ হিসেবে মত দেয়। ১৮৫৭ সালে নিহাঙ্গ শিখদের একটি দল রামজন্মভূমিতে পূজা দেয়— এই সত্যটিও কোর্টে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বামপন্থী ঐতিহাসিকদের ডিগবাজি খাওয়া মামলা চলাকালীন সবসময়ই চলতে থাকে। এলাহাবাদ হাইকোর্ট বাবরি মসজিদের পক্ষে থাকা তথাকথিত 'বিশেষজ্ঞ' ঐতিহাসিকদের কোর্ট ও কোর্টের বাইরে করা এই মিথ্যাচারে স্তম্ভিত হয়ে যায়। কেউ বলেছেন, মসজিদের বিশেষত্ব নিয়ে কিছু জানেন না, কেউ বলেছেন বাবরি মসজিদ সম্পর্কে কোনো অধ্যয়নই করেননি। এইসব ঐতিহাসিকরা যেভাবে কোর্টকে বিভ্রান্ত করেছেন তা নিজেই একটা 'ইতিহাস' সৃষ্টি করেছে। এদের সত্য প্রকাশে সদিচ্ছা তো ছিলই না বরং ঘটনাপ্রবাহ এদের দুরভিসন্ধি স্পষ্ট করে দেয়। তাহলে কি সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিতর্কের অবসান হোক, তাঁরা চাননি? তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আনুগত্য কি ঐতিহাসিক হিসেবে তাদের কর্তব্য, ন্যায়পরায়ণতাকেও উপেক্ষা করতে বাধ্য করেছিল? কখনো শিববেদীকে মুসলিমদের কবর বলা, কখনো রামজন্মভূমি থেকে পাওয়া শিলালিপি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করা, প্রত্নতাত্ত্বিক রিপোর্টকে অযৌক্তিক আক্রমণ--- এভাবেই বামপন্থী ঐতিহাসিকদের মিথ্যাচার চলতে থাকে। তাঁরা হয়তো ভেবেছিলেন বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদতে থাকবে। কিন্তু রামজন্মভূমির ক্ষেত্রে যে তা হয়নি সেটা আজ প্রমাণিত। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মীনাক্ষী জৈন তাঁর 'The Battle for Ram : Case of the Temple at Ayodhya' বইতে রামমন্দির ধ্বংস করে মসজিদ তৈরির বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রমাণ দিয়েছেন। ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত মিরজা জান তার 'হাদিকাহ-ই- সুহাদা'য় ফার্সিতে লেখা তথ্যসূত্র উল্লেখ করে বাবরের মন্দির ধ্বংসের কথা বলেন। ১৯১৯ সালে প্রকাশিত উর্দুতে লেখা 'তারিখ-ই-আওয়াধ'-এ বলা হয় জন্মস্থান-এর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে বাবর মসজিদ নির্মাণ করে। আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফজল অযোধ্যাকে পবিত্র স্থান বলে উল্লেখ করে। অস্ট্রিয়ার জেসুইট টিফেনহেলার ১৭৬৬ থেকে ১৭৭১ সালে আওয়াধে ভ্রমণ করেন। তিনি বাবরের দ্বারা বিষ্ণুর অবতার রামের মন্দির ধ্বংসের কথা উল্লেখ করেন। শুধু তাই নয়, রামজন্মভূমিতে হিন্দুদের একটি বেদীকে পূজার ঘটনা ও সেই স্থানে রামনবমীতে হিন্দুদের আগমনের ঘটনার উল্লেখ করেন।

জার্মান ভারততত্ত্ববিদ এ্যান্টন ফুয়েরার, যিনি লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ামের কিউরেটর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভেয়ার ছিলেন, লিখেছেন— 'The old temple of Ramachandra at Janmasthanam must have been a very fine one, for many of its columns have been used by the Musalmans in the construction of Babar's masjid'। অর্থাৎ ১৮৮৯ সালে মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ তৈরির বিষয়ে বিদেশি পর্যটক ও আধিকারিকরা স্পষ্ট করে বলেছেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্ট্যাটিসটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের প্রধান এডওয়ার্ড থর্নটন ১৮৫৮ সালে গেজেটে মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ তৈরির কথা বলেন। ১৮২২ সালে তৎকালীন ফৈজাবাদ কোর্টের এক আধিকারিক হাফিজুল্লাহ-র তরফে কোর্টকে দেওয়া তথ্যে বাবরের মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ তৈরির উল্লেখ পাওয়া যায়।

কমিউনিস্ট ঐতিহাসিকরা বর্তমান অযোধ্যাকে, প্রাচীন তথা বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যা হিসেবে মানতেও দ্বিধা করেন। কিন্তু বিভিন্ন জৈন সাহিত্যে বর্তমান অযোধ্যাকে শ্রীরামজন্মভূমি অযোধ্যা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সহস্র বছর ব্যাপী শ্রীরামের প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রেখে বিচারের অপেক্ষায় থাকা সাধারণ ভারতবাসীর প্রশ্নকে কবিগুরুর ভাষায় বলা যায়—

'বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা।

এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা।'

না, ধুলায় হারিয়ে যায়নি বরং সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বমহিমায়। অযোধ্যায় এখন প্রাণ প্রতিষ্ঠার অপেক্ষায় রামলালার নির্মীয়মাণ গগনচুম্বী মন্দির। রামজন্মভূমির রায়, রামমন্দির পুনরুদ্ধারের অনাবিল আনন্দের মধ্যে ভারতবাসীকে ভাবতে বাধ্য করেছে ভারতের ইতিহাসকে কমিউনিস্টদের দুষ্টচক্র থেকে উদ্ধার করলেই দেশরক্ষা সম্ভব।

তথ্যসূত্র : The battle for Rama, Case of the Temple at Ayodhya -- Meenakshi Jain.

An Indian I Am -- K. K. Muhammed.

লক্ষ কণ্ঠে 'হে পার্থসারথী বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ' গানে বিশ্ব রেকর্ডের শরিক সংস্কার ভারতী

তিলক সেনগুপ্ত

ব্রিগেড রাজনৈতিক সভা দেখেছে বহু। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বুকে নতুন ইতিহাসের স্বাক্ষী থাকল বিগ্রেড। লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হলো গীতার শ্লোক। যে মঞ্চ একাধিক বিশ্ব রেকর্ড করল। অনুষ্ঠানে লক্ষ কণ্ঠে 'হে পার্থসারথী বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য' গান পরিবেশনে বিশ্ব রেকর্ডের অংশীদার সংস্কার ভারতী।

গত ২৪ ডিসেম্বর কলকাতা ময়দানে আয়োজিত হয়েছে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের অনুষ্ঠান। মূল উদ্যোক্তা সনাতন সংস্কৃতি পরিষদ, অখিল ভারতীয় সংস্কৃত পরিষদ, মতিলাল ভারত তীর্থ সেবা মিশন এবং অন্যান্য আরও ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান। রবিবার কাক ভোর থেকে সমাবেশ স্থলে মানুষে-মানুষে পরিপূর্ণ। সকাল হলেও কুয়াশা চাদরে মোড়া বিগ্রেডে লোকে লোকারণ্য। বেলা ১০টা বাজতেই গানে গানে শুরু হয়েছে ব্রিগেডে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের অনুষ্ঠান। রাষ্ট্রবাদী সাংস্কৃতিক সংগঠন সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের শিল্পী দলের নেতৃত্বে গাওয়া হলো দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধনধান্য পুষ্পভরা'-সহ চারটি দেশাত্মবোধক গান।

কলকাতায় এই প্রথম এমন আয়োজন। লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সকাল থেকেই বিভিন্ন জেলা থেকে হাওড়া স্টেশনে আসতে শুরু করেছেন মানুষজন। তাঁদের সুবিধার্থে অখিল ভারতীয় সংস্কৃত পরিষদের পক্ষ থেকে হাওড়া স্টেশনের বিপরীতে মঞ্চ করা হয়েছে। সেখান থেকেই তাঁদের যাওয়ার সহযোগিতা করা হচ্ছে। অনেকে আবার লঞ্চে বা বাসে কলকাতায় যাচ্ছেন।

ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের ঐতিহাসিক সভার সাংস্কৃতিক মঞ্চে ৬০ জন সংস্কার ভারতীয় শিল্পীর নেতৃত্বে ও পরিচালনায় গাওয়া হলো কাজী নজরুলের বিখ্যাত গান--- 'হে পার্থসারথি বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য-শঙ্খ'। যে গান গত তিন মাস ধরে সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা নিয়মিত অভ্যাস করেছেন। এমনকী জেলায় জেলায় গীতাপ্রেমী সংগঠকদের কাছে গিয়েও তারা এই গান অভ্যাস করিয়েছেন। গানের কথা, স্বরলিপি, অডিয়ো ট্র্যাক পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ব্লকে এই গানের অভ্যাসের ব্যবস্থা করা হয়। নজরুলসংগীত গাওয়ার বিশ্ব রের্কড গড়তে এই প্রথম লক্ষ মানুষ সমবেত সুরে তাঁর লেখা গান গাইলেন। এদিন গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের জন্য ওই সংস্থার কর্তারাও মাঠে উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের অন্যতম উদ্যোক্তা রিষড়া প্রেমমন্দির আশ্রমের প্রধান স্বামী নির্গুণানন্দজী বলেন, 'নজরুল ইসলামের লেখা এই গান পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপকভাবে প্রচলিত। বাংলাভাষায় গীতা প্রসঙ্গে এর চেয়ে ভালো গান আর লেখা হয়নি। তাই তাঁর গানটিকে বেছে নিয়েছি আমরা। এই গান তাঁর জীবদ্দশা থেকেই এই বঙ্গভূমির প্রতিটি মঠ-মন্দির ও আশ্রমে গীতা জয়ন্তীর দিন গাওয়ার রীতি আছে। এটি আমাদের গীতা প্রচারের প্রচলিত সংগীত। যা আজ নতুন করে বিশ্ব রেকর্ড করল।'

সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'আজ থেকে ছয় মাস আগে এই রাজ্যের সন্ত সমাজ যখন এই কার্যক্রমের পরিকল্পনা শুরু করেন তখন থেকেই সাংস্কৃতিক মঞ্চ পরিচালার জন্য সংস্কার ভারতীকেই তারা দায়িত্ব দেন। সেই মতো সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা 'হে পার্থসরথী বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ' গানের অভ্যাস শুরু করে। আজ তাই এই নতুন ইতিহাস রচনায় সংস্কার ভারতী নেতৃত্ব দেওয়ায় আমরা গর্বিত।' □

বিদেশের মাটিতে সাফল্যের জয়যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কারও অন্তরে দুর্জয় সাহস ও কঠোর পরিশ্রমের প্রতিজ্ঞা থাকলে তার সাফল্য সুনিশ্চিত। রাকেশ পাণ্ডের জীবনের কাহিনি অনেকটা এইরকম। বিহারের চম্পারণের একটি অতি সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা রাকেশ পাণ্ডের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের শাখা-প্রশাখা আজ বহু দেশে বিস্তৃত। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি 'ব্র্যাভো ফার্মা' বিভিন্ন দেশে ক্যান্সারের ওষুধ উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। এই কোম্পানিটি এইডস্ রোগের কারণ এইচআইভি-র বিষয়ে প্রতিনিয়ত গবেষণা অব্যাহত রেখেছে। ছাত্রাবস্থায় রাকেশ উচ্চশিক্ষার জন্য পাটনা এলে, তাঁকে পাটনায় রেখে পড়াশোনা করানোর মতো আর্থিক ক্ষমতা তাঁর বাবার ছিল না। রাকেশ তাঁর বাড়ির অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এই কারণে তিনি পাটনার একটি হোটেলে খাবার পরিবেশক বা ওয়েটারের কাজ করে পড়াশোনার খরচ সংগ্রহ করতেন।

পাটনায় পড়াশোনা শেষ করে তিনি দিল্লি চলে আসেন। দিল্লিতে একটি মার্কেটিং কোম্পানিতে ৬ হাজার টাকা মাইনের একটি চাকরিতে যোগ দিলেন। তারপর অনেক দিন ধরে সেই কোম্পানির উৎপাদিত পণ্য বিক্রির কাজে যুক্ত রইলেন। তাঁর জন্য ধার্য লক্ষ্যমাত্রা তিনি প্রতিবার অতি সহজেই পূর্ণ করতেন। তাঁর দক্ষতা লক্ষ্য করে কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট একদিন তাঁকে ডেকে পরামর্শ দিলেন যে তুমি তোমার এই কাজটাই তোমার নিজের তৈরি একটি কোম্পানির মাধ্যমে অব্যাহত রাখো। সেই সময় রাকেশের কাছে এহেন পরামর্শ যেন ছিল এক স্বপ্নের মতো! ২০১১ সালে তাঁর কিছু বন্ধুর আর্থিক সাহায্যে তিনি 'ব্র্যাভো ফার্মা' নামে একটি কোম্পানি স্থাপন করলেন। এই কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠার পেছনে ছিল তাঁর কঠোর পরিশ্রম। দিন-রাত এক করে তিনি কাজ করতেন। এইভাবে কোম্পানির ব্যবসার পরিমাণ বাড়তে থাকে। কোম্পানির ব্যবসায়িক পরিধি বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরও অনেককে তাঁর কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত করলেন। এইভাবে মাত্র ১২ বছর বয়সি এই কোম্পানিটি আজ একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। কোম্পানিটির বার্ষিক ব্যবসার পরিমাণ ১০০ কোটি টাকারও বেশি। ব্রিটেন, ফিনল্যান্ড ছাড়াও আফ্রিকা, মধ্য এশিয়ার একাধিক দেশে এই কোম্পানিটির কর্মকাণ্ড বর্তমানে বিস্তৃত। রাকেশ জানান যে সস্তায়, অনেক কম দামে ওষুধপত্র উৎপাদন ও সরবরাহ করা হলো তাঁর কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য।

রাকেশ পাণ্ডে শুধুমাত্র একজন ব্যবসায়ী নন। দেশ তথা সমাজের প্রতিও তাঁর কিছু অবদান আছে। সম্প্রতি তাঁর উদ্যোগে 'চম্পারণ-কাশ্মীর সদ্ভাবনা যাত্রা' শুরু হয়েছে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিহারের ১০০ জনেরও বেশি যুবকের জম্মু-কাশ্মীর ভ্রমণের সব ব্যয় তিনি বহন করেন। তাঁর এহেন উদ্যোগ গ্রহণের উদ্দেশ্য হলো যাতে দেশের যুবসমাজ— শঙ্করাচার্য মন্দির, ক্ষীর ভবানী মন্দির, ত্রেহগামের শিব মন্দির, মার্তণ্ড সূর্য মন্দির ও শারদাপীঠ দর্শন করতে পারে, কাশ্মীরের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পরম্পরার বিষয়ে অবগত হতে পারে। বিশেষত যে স্থানগুলিকে বার বার ধ্বংসের প্রচেষ্টা হওয়া সত্ত্বেও সেই স্থানগুলি তাদের মহিমা-গরিমা পুনরুদ্ধার করে তাদের হৃতগৌরব পুনরায় অর্জন করেছে। এই যাত্রার মাধ্যমে তিনি যুবসমাজকে এই বার্তাও দিচ্ছেন যে ভারতীয় সংবিধানের জম্মু-কাশ্মীর সংক্রান্ত ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ বাতিল ঘোষণার পরবর্তী পর্যায়ে উপত্যকা জুড়ে এক আমূল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। এরই সঙ্গে তিনি সমগ্র কাশ্মীর জুড়ে ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতেও আগ্রহী। রাকেশ বলেন, কেউ শীর্ষ স্থান অধিকার করলেও, তার পা যেন সর্বদা মাটিকে স্পর্শ করে থাকে, তার শিকড়কে যেন সে কখনোই না ভোলে। তার সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রতি যেন সে চির নিষ্ঠাবান থাকে।

কোভিড মহামারী চলাকালীন রাকেশ পাণ্ডে অসংখ্য লোকের প্রতি বাড়িয়ে দেন সাহায্যের হাত। এই নিরন্তর সমাজসেবামূলক কাজকর্মের জন্য একাধিক পুরস্কারে ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। একদা ৬ হাজার টাকা মাইনের চাকুরিরত রাকেশ পাণ্ডের নিজের ব্যবসার পরিধি আজ বহু দেশে প্রসারিত। প্রবল অধ্যবসায় দ্বারা অর্জিত ব্যবসায়িক সাফল্যের সঙ্গে নিজ ধর্ম ও সংস্কারের বিষয়ে সদা নিষ্ঠাবান রাকেশ পাণ্ডে এই যুবসমাজের কাছে সব দিক থেকে সার্থক ব্যক্তিত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ। ▯

সাধু যখন রাজা

এক সাধু ছিলেন। তিনি একদিন পথ চলতে চলতে এক নগরপ্রান্তে এসে পৌঁছলেন। কিন্তু সন্ধ্যা সমাগত হওয়ায় সেদিনের মতো নগরদ্বার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সাধু তাই সে রাত্রির মতো নগরদ্বারের বাইরেই শয্যাগ্রহণ করলেন। দৈবযোগে সেদিনই সেই নগরের রাজা দেহরক্ষা করেছেন। রাজা অপুত্রক ছিলেন। সেজন্য রাজ্যলোভে রাজার আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে মারামারি শুরু হয়ে গেল। সকলেই বলতে লাগল তার অধিকার সবচাইতে বেশি। শেষে মন্ত্রীমণ্ডলী ঠিক করল যে আগামীকাল সকালে নগরদ্বার খোলা হলে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম নগরে প্রবেশ করবে তাকেই রাজা করা হবে। এরফলে বিবাদ মিটে গেল।

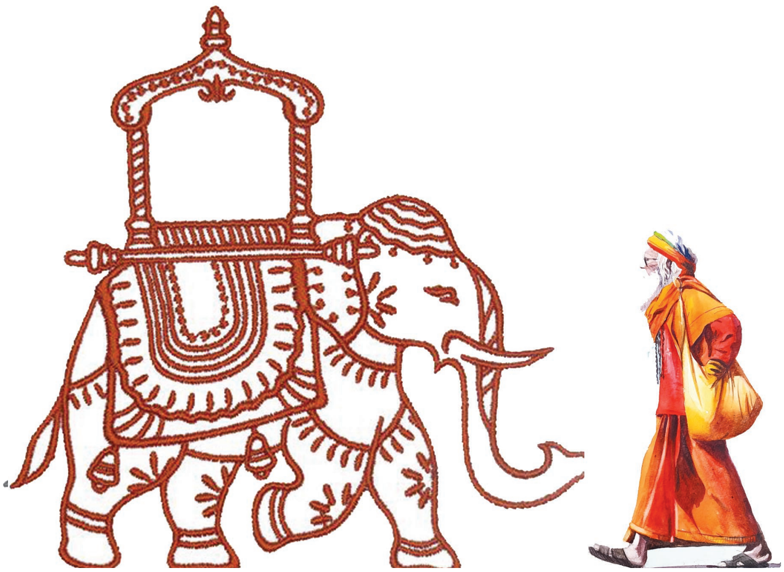

পরদিন সকালে নগরদ্বার খুলতেই সেই সন্ন্যাসী সর্বপ্রথম ভেতরে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি সুসজ্জিত হাতি মাহুতের ইশারায় সন্ন্যাসীকে শুঁড়ে উঠিয়ে হাওদায় বসিয়ে দিল। নগরের লোকেরা জয়ধ্বনি দিতে লাগল। সন্ন্যাসীকে নিয়ে হাতি রাজদরবারে পৌঁছে গেল। সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করলেন এসব কী ব্যাপার? মন্ত্রীমণ্ডলী তাঁকে সব বিষয় জানাল। সন্ন্যাসী স্নান সেরে অভিষেকের জন্য তৈরি হলেন। অবশ্য তার আগে তিনি একজনকে একটি বাক্স আনতে বললেন। বাক্স নিয়ে আসা হলে সন্ন্যাসী তাঁর পরনের গেরুয়া কাপড়, ভিক্ষাপাত্র ও খড়ম তার মধ্যে রেখে দিলেন। মহা ধুমধামে রাজ্যাভিষেক হয়ে গেল।

রাজা হয়ে সন্ন্যাসী সুন্দরভাবে রাজত্ব চালাতে লাগলেন। তিনি রাজ্য পরিচালনাকে ঈশ্বরের কাজ বলে মনে করলেন। রাজ্যে সুশাসন ও সমৃদ্ধি ফিরে এল। এতে রাজ্যের প্রভূত উন্নতি হলো। রাজকোষ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। প্রজারা অত্যন্ত সুখী হলো।

রাজ্যের এরূপ সমৃদ্ধি দেখে প্রতিবেশী রাজ্যের রাজা ওই রাজ্য দখল করে নেওয়ার মনস্থ করলেন। তিনি ভাবলেন, সন্ন্যাসী ভালোভাবে রাজ্য পরিচালনা করতে জানলেও নিশ্চয় যুদ্ধে ততটা পারদর্শী নয়। তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। সন্ন্যাসী-রাজার গুপ্তচর খবর দিল প্রতিবেশী রাজা তাদের রাজ্য দখল করতে আসছে। সন্ন্যাসী-রাজা বললেন, আসতে দাও।

সন্ন্যাসী-রাজা আগেই জেনেছিলেন, ওই প্রতিবেশী রাজা আর কেউ নয়, এই রাজ্যের আগেকার রাজার ভাইপো। তিনি চরের মাধ্যমে খবর পাঠালেন, তারা কেন যুদ্ধ করতে এসেছেন? প্রতিবেশী রাজা জানালেন, তারা এই রাজ্য দখল করে তার রাজ্য আরও বড়ো করতে চান। সন্ন্যাসী-রাজা জানালেন, রাজ্য বড়ো করার জন্য যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। এই রাজ্য আমি আপনাকে দান করে দিচ্ছি।

সন্ন্যাসী-রাজা তাঁর এক অনুচরকে বললেন তার বাক্সটি নিয়ে আসতে। অনুচর বাক্স নিয়ে এলে সন্ন্যাসী-রাজা রাজবেশ খুলে তাঁর রেখে দেওয়া সন্ন্যাসীবেশ পরিধান করে হাতে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে প্রতিবেশী রাজাকে বললেন, এতদিন দিন এই রাজ্য আমি চালিয়েছি, এখন আপনি চালান। আমি আপনার ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিলাম। আপনি এসে গেছেন, এই রাজ্যের ভার আমি আপনাকে দিলাম, আর আমি আমার আশ্রমে ফিরে চললাম।

ছোটো বন্ধুরা, এই গল্পের অর্থ এই নয় যে, শত্রু আক্রমণ করতে এলে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজের যথাসর্বস্ব দিয়ে দিতে হবে। এই অন্তর্নিহিত অর্থ হলো কোনো কাজ সামনে এলে তা ভগবান প্রেরিত মনে করে দায়িত্ব সহকারে অনাসক্ত হয়ে পালন করা উচিত। প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে মনে কোনো দুঃখ না রেখে পুনরায় নিজের কাজে মনোনিবেশ করা উচিত।

গায়ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

বীর বনবাসী

রানি গাইদিনল্যু

নাগা জনজাতি সমাজের আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক নেত্রী ছিলেন রানিমা গাইদিনল্যু। তাঁর জন্ম ১৯১৫ সালের ২৬ জানুয়ারি মণিপুরে। তেরো বছর বয়সেই নাগা নেতা জাদোনাগের দ্বারা প্রভাবিত হন। জাদোনাগের মৃত্যুর পর মাত্র ষোলো বছর বয়সে চার হাজার নাগা যোদ্ধাকে নিয়ে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ১৪ বছর তিনি কারাজীবন ভোগ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হলে মুক্তিলাভ করার পর তিনি নাগা সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য নিজেকে সমর্পণ করেন। তিনি বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি তাম্রপত্র (১৯৭২), পদ্মভূষণ (১৯৮২), বিবেকানন্দ সেবা সম্মান (১৯৮৩), ভগবান বিরসা মুণ্ডা পুরস্কারে (মরণোত্তর) ভূষিত হন। ১৯৯৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি পরলোকগমন করেন।

এসো সংস্কৃত শিখি-৫

(ক্লীবলিঙ্গে)

তৎ কিম্— ওটা কী?

তৎ পুস্তকম্— ওটা বই।

তৎ কিম্? — তৎ ভবনম্।

তৎ কিম্ — তৎ চিত্রম্।

তৎ পুষ্পম্ । তৎ গৃহম্।

তৎ ......? তৎ সোপানম্।

তৎ.........? ..... যানম্।

অভ্যাস করি ঃ

উপনেত্রম্, পর্ণম্, ক্রীড়নকম্, উদ্যানম্, মন্দিরম্, শস্যম্, জলযানম্, ব্যঞ্জনম্।

ভালো কথা

গাঁদার মেলা

আমাদের বাড়ির পাশে রাইদিদিদের বাড়ির ছাদে এখন ফুলের মেলা। ছাদভর্তি টবে শুধু নানা জাতের নানা রঙের গাঁদাফুল। এত ফুল ফুটেছে যে গাছের পাতা ও টব দেখাই যাচ্ছে না। রাইদিদিদের বাড়িতে সরস্বতী পূজা হয়, তখন ওরা ফুলের টব দিয়েই মণ্ডপ সাজায়। গত বছর ফুলের টব দিয়ে 'বাণী বন্দনা' লিখেছিল। রাইদিদি বলল এবার 'মা সরস্বতী' লিখবে। প্রতিদিন কত মানুষ ওদের ছাদে ফুল দেখতে আসে। একটি প্ল্যাকার্ডে রাইদিদি লিখে রেখেছে 'দয়া করে ফুলগাছে হাত দেবেন না'।

অপর্ণা ঘোষাল, দ্বাদশ শ্রেণী, সোনালি পার্ক, কলকাতা-৪৭।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ন্দা ন মা

(২) মা য় ল

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) মো ম য়া র নি হা

(২) ক ক রে র হ ম

২৫ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) স্মিতহাস্য (২) অবরুদ্ধ

২৫ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) পদ্মপলাশলোচন (২) রামচরিতমানস

উত্তরদাতার নাম

(১) শ্রেয়সী রায়, রায়নগর, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা। (২) শুভম সেন, মালদা, পুরুলিয়া।
(৩) প্রতিমা মহান্তি, বরাবাজার, পুরুলিয়া। (৪) সৈকত হালদার, ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪

৯০৫১৭২১৪২০

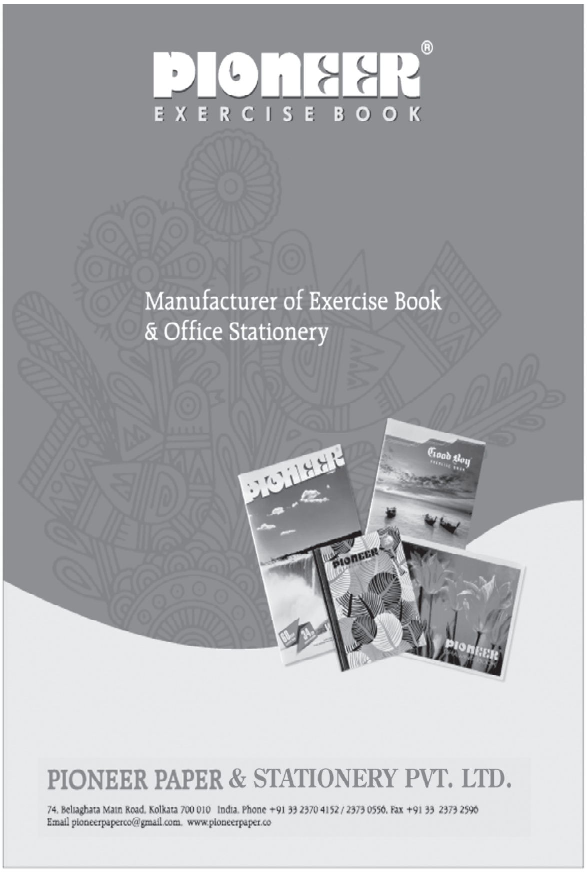

With Best Compliments from -

A

Well wisher

শ্রীরামমন্দির : একটি কালোত্তীর্ণ সৌধ নির্মাণ প্রকল্প

অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ফলে প্রশস্ত হয় অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমিতে রামমন্দির নির্মাণের পথ। সেই রায়দানের ৪ বছরের কিছু বেশি সময় পর আজ এই ভব্য মন্দির নির্মাণ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ পরিসমাপ্তির দ্বারপ্রান্তে। 'নাগর' স্থাপত্যশৈলীর অন্তর্গত এই মন্দিরের স্থাপত্য-পরিকল্পনাকারী দলের প্রধান হলেন স্বনামধন্য স্থপতি চন্দ্রকান্ত ভাই সোমপুরা। তাঁর পিতা প্রভাকর সোমপুরা ছিলেন গুজরাটের সোমনাথ মন্দির এবং মথুরায় শ্রীকৃষ্ণমন্দিরের স্থপতি।

মন্দিরটি প্রধানত মির্জাপুর ও রাজস্থানের বংশী-পাহাড়পুর হতে সংগৃহীত গোলাপি বেলেপাথর ও খোদিত মার্বেল পাথর দ্বারা নির্মিত। এর পাশাপাশি, ১৭ হাজার গ্র্যানাইট পাথর (প্রতিটির ওজন ২ টন) এই নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই জানান, প্রায় ২১ লক্ষ কিউবিক ফিট মাপের গ্র্যানাইট, বেলেপাথর ও মার্বেল পাথর এই মন্দির নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে।

মন্দিরটি হতে চলেছে দীর্ঘস্থায়ী

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে মন্দিরটির নির্মাণে ইস্পাত ও সাধারণ মানের সিমেন্টের ব্যবহার হয়নি। চেন্নাই আইআইটি-র বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তরের গভীরতা ১২ মিটার। ভিত নির্মাণের ক্ষেত্রে স্থাপত্য শিল্পের প্রয়োজনে যে ধরনের মাটি দিয়ে ভিত পূরণ করা হয় তা ২৮ দিনের মধ্যেই প্রস্তরে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। এই মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর এইভাবে মোট ৪৭টি স্তরে বিন্যস্ত। চম্পত রাই বলেন যে আগামী ১০০০ বছর এই নবনির্মিত মন্দিরের কোনো মেরামতির প্রয়োজন পড়বে না। রিখটার স্কেল অনুযায়ী ৬.৫ তীব্রতা সম্পন্ন ভূমিকম্পেও এই মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। ১৯৯২ সালের 'শিলা দান' কার্যক্রমের সময় এবং তার পরবর্তী অধ্যায়ে, বিগত ৩ দশক ধরে মন্দির নির্মাণের লক্ষ্যে অযোধ্যার করসেবকপুরমে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফে নিয়ে আসা সব ইট ও পাথর নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

দুইটি পর্যায়ের কাজ এখনও বাকি

মন্দির নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যান নৃপেন্দ্র মিশ্র নির্মাণের প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তির লক্ষ্যে, ১৫ ডিসেম্বরের সময়সীমা ধার্য করেছিলেন। প্রথম পর্যায়ের কাজের মধ্যে পড়ছে মন্দিরের প্রথম তল যেখানে গর্ভগৃহটি অবস্থিত।

মন্দিরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তল নির্মাণ প্রকল্পের মধ্যে চতুষ্কোণ বিশিষ্ট মূল স্তম্ভ এবং তার সঙ্গে ৩৬০টি বিশালাকৃতির স্তম্ভ নির্মাণ, স্তম্ভ সমূহের গাত্রে খোদিত মূর্তিশিল্প সমন্বিত ভাস্কর্য ও ম্যুরালের অসাধারণ কারুকার্যের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যা ২০২৪-এর ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে। মন্দিরের দ্বিতীয় তলে প্রতিষ্ঠিত হবে 'রাম দরবার', যার প্রতিটি স্তম্ভের মধ্যে ২৫-৩০টি মূর্তি থাকবে খোদিত। মূল মন্দির প্রাচীরের বাইরের প্রাঙ্গণে ২০২৪ সালেই মহর্ষি বাল্মীকি, ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র, নিষাদরাজ ও শবরীমাতার মোট ৭টি মন্দির নির্মিত হবে।

তৃতীয় পর্যায়ে, ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে— ৭১ একর জমিতে সভাগৃহ (অডিটোরিয়াম)-সহ সমগ্র মন্দির প্রাঙ্গণের সীমানা পরিবৃত প্রাচীর গাত্রে শোভিত-সজ্জিত ব্রোঞ্জ ম্যুরালের ভাস্কর্য এবং সপ্তর্ষি মন্দির নির্মাণ সমাপ্ত হবে।

রামলালার দেববিগ্রহ রহস্য

অযোধ্যার তিনটি পৃথক স্থানে নির্মিত রামলালার (৫ বছর বয়সি শিশু রাম বা আরাধ্য রাম) তিনটি বিগ্রহের মধ্যে থেকে একটি দেববিগ্রহকে ২২ জানুয়ারি, রামলালার অভিষেক অনুষ্ঠানের আগে সবরকম গোপনীয়তা রক্ষা করে শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ চয়ন করবেন। তাঁদের চয়নিত বিগ্রহটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে নবনির্মিত রামমন্দিরের গর্ভগৃহে স্থাপিত হবে। আগামী ২৭ জানুয়ারি হতে জনসাধারণ এই প্রতিষ্ঠিত রামলালার বিগ্রহ দর্শনের সুযোগ পাবেন। ট্রাস্টের সম্পাদক চম্পত রাই জানিয়েছেন, শ্রীরামচন্দ্রের পাঁচ বছরের শিশুরূপকে কল্পনা করে ৫১ ইঞ্চি উচ্চতার তিনটি বিগ্রহ তৈরি করানো চলছে। ঐশ্বরিক গুণে যে বিগ্রহটি শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে এবং যে বিগ্রহটিতে শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যবেলার মুখচ্ছবি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে, সেটিকেই চূড়ান্ত করা হবে বলে তিনি জানান।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পূর্বতন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, বর্তমানে মন্দির নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যান নৃপেন্দ্র মিশ্র জানান রামলালার বিগ্রহ নির্মাণের জন্য তিন জন ভাস্করকে তাঁদের পছন্দসই পাথর-সহ অযোধ্যায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। দেববিগ্রহ নির্মাণের লক্ষ্যে একজন পৌঁছেছেন শ্বেত মাকরানা মার্বেল পাথর নিয়ে এবং অন্য দু'জন শিল্পী কর্ণাটক হতে 'কৃষ্ণশিলা' নামে পরিচিত ধূসর রঙের পাথর নিয়ে অযোধ্যা এসেছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব রক মেকানিক্স দ্বারা পরীক্ষিত শিলাসমূহ বিগ্রহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে। সেই পরীক্ষার ফলাফল এলেই বিগ্রহ তৈরির কাজ শুরু করার ব্যাপারে শিল্পীদের সবুজ সংকেত দেওয়া হবে। তিনটি বিগ্রহেরই উচ্চতা হবে ৫১ ইঞ্চি, তাদের দুই হাতে থাকবে তির ও ধনুক। বেদীর ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি বিগ্রহের উচ্চতা হবে ৭ ফুট যা বিগ্রহের ২৫ ফুট দূর থেকে ভক্তরা দর্শন করবেন। এছাড়াও, মন্দিরটি হবে আলোকবিজ্ঞান সম্পর্কিত একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। কাচ (লেন্স) ও আয়না সমন্বিত একটি বিশেষ পদ্ধতিগত ব্যবস্থার মাধ্যমে বিক্ষেপণ ও প্রতিফলনের দ্বারা প্রতিটি রামনবমী

তিথিতে বেলা ১২টার সময় দেববিগ্রহের ললাটে সূর্যালোক স্পর্শ করবে। রুরকি-র সেন্ট্রাল বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং পুনের অ্যাস্ট্রোফিজিক্স ইনস্টিটিউট এই ব্যবস্থার উদ্ভাবক। ট্রাস্টের তরফে একটি ছবি প্রকাশ করে আগেই জানানো হয়েছিল যে, রামমন্দিরের গর্ভগৃহের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। এমনকী সেখানে আলোকসজ্জার কাজও শেষ। এবার কেবল রামলালার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পালা। রামমন্দির প্রাঙ্গণে থাকবে শ্রীগণেশ, সূর্যদেব, ভগবান শিব, দেবী দুর্গা, দেবী অন্নপূর্ণা ও শ্রীহনুমানের মন্দিরসমূহ। এছাড়াও মন্দির প্রাঙ্গণে জটায়ুর একটি মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত হবে। অযোধ্যার সৌন্দর্যায়ন ও আলোকসজ্জার উদ্দেশ্যে এই শহরের ধর্মপীঠ রোডে ৪০টি সূর্য স্তম্ভ (specially designed streetlights) স্থাপিত হয়েছে।

সমগ্র মন্দিরের অন্তর্গত জমির পরিমাণ : ৭১ একর

সমগ্র মন্দির নির্মাণের আনুমানিক খরচ : ১৮০০ কোটি টাকা

মূল মন্দিরের অন্তর্গত জমি : ৩ একর

এখনও পর্যন্ত নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত শিলার মোট আয়তন : ২১ লক্ষ কিউবিক ফুট

মূল মন্দিরের দৈর্ঘ্য : ৩৮০ ফুট

মূল মন্দিরের প্রস্থ : ২৫০ ফুট

মূল মন্দিরের উচ্চতা : ১৬১ ফুট

প্রতিটি তলের মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত উচ্চতা : ২০ ফুট

সিংহদ্বার হতে প্রবেশের পর মূল মন্দিরের পথে ৩২টি সিঁড়ি, উচ্চতা— ১৬.৫ ফুট

রামলালার বিগ্রহের উচ্চতা : ৫১ ইঞ্চি

দেববিগ্রহ দর্শনের জন্য প্রতি জন ভক্তের জন্য নির্ধারিত সময় : ২০ সেকেন্ড

দেববিগ্রহ হতে দর্শনার্থীস্থানের দূরত্ব : ২৫ ফুট

নতুন অযোধ্যা নগরী নির্মাণে মোট ব্যয় বরাদ্দ : ৫০,০০০ কোটি টাকা

গ্রিনফিল্ড টাউনশিপ— যার অন্তর্গত লক্ষ্ণৌ-গোরক্ষপুর জাতীয় সড়ক। এছাড়াও, আবাসিক (রেসিডেন্সিয়াল), ব্যবসায়িক (কমার্শিয়াল), মিশ্র ব্যবহারযোগ্য জমি। ধর্মীয় সংস্থা, মঠ-মিশন, আশ্রম, পর্যটন ক্ষেত্র তথা হোটেল ও রিসর্টের জন্য উত্তরপ্রদেশ হাউজিং বোর্ড কর্তৃক চিহ্নিত সব রকম জমি। মোট প্রকল্প ব্যয়— ৩,০০০ কোটি টাকা। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত।

নিকাশি ব্যবস্থা : ১৩৩.৫ কিলোমিটার বিস্তৃত, প্রায় ২০ হাজার বাড়িকে নিকাশি পরিষেবা প্রদানের উপযুক্ত। মোট ব্যয় : ২৪৫ কোটি টাকা।

নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য ও পার্কিং : ১৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে দোকান ও ডর্মেটরির সুবিধাযুক্ত প্রায় ৭০০টি চার-চাকা গাড়ির পার্কিঙের উপযুক্ত চারটি ইন্টিগ্রেটেড পার্কিং কমপ্লেক্স।

রাস্তা : অযোধ্যার সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের অন্যান্য জেলা সমূহের যোগাযোগ স্থাপনে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ১০,০০০ কোটি টাকার প্রকল্প।

বাঁধা রোড : ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে সরযূ নদী ও তার শাখানদীর পাড় বরাবর গুপ্তার ঘাট ও রাজ ঘাটকে সংযুক্ত করে ৪.৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য ও ৬ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট নয়নাভিরাম রাস্তা। নদীবাঁধগুলির পুনর্নির্মাণ।

'অযোধ্যা ধাম' রেলওয়ে স্টেশন : ২৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩টি পর্যায়ে নির্মিত ও সমাপ্ত স্টেশন। রেল চলাচলের অতিরিক্ত চাপ নিরসনে ভূমি থেকে উত্থিত রেলপথের ব্যবস্থা। রেল স্টেশনের ওপর দিয়ে

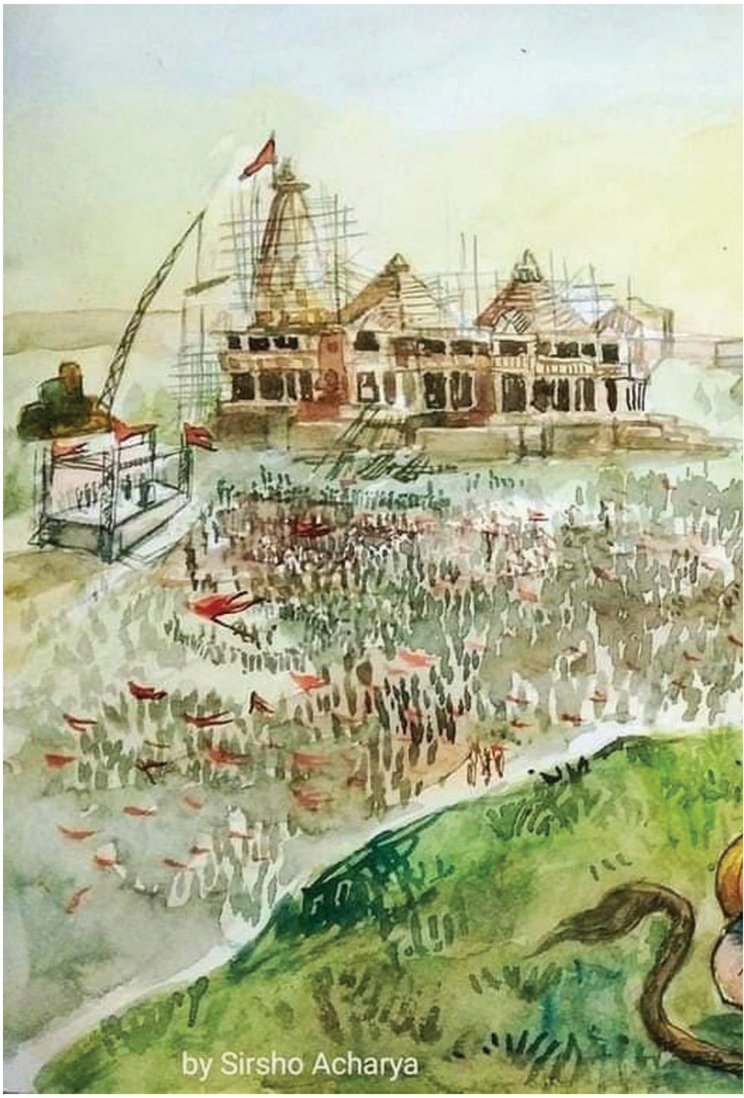

যানবাহনের যাতায়াতের জন্য ৫৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ৬টি রেল ওভারব্রিজ।

মহর্ষি বাল্মীকি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর অযোধ্যা ধাম : ১,৩৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮২১ একর জমিতে নবনির্মিত অত্যাধুনিক ব্রাউনফিল্ড ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, ২০২৪ সালের ১০ জানুয়ারি থেকে যার বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের পুরোদমে সূত্রপাত হবে।

৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নবনির্মিত অযোধ্যা ধাম রেলওয়ে স্টেশন এবং মহর্ষি বাল্মীকি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের শুভ উদ্বোধন করেন।

রামপথ : ৮৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে শাহাদাতগঞ্জ থেকে নয়া ঘাট সংযোগকারী ১৩ কিলোমিটার রাস্তার উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণ। এই রাস্তাটি লক্ষ্ণৌ-অযোধ্যা-গোরক্ষপুর সংযোগকারী জাতীয় সড়কের সঙ্গে রামমন্দির ও সরযূ ঘাটগুলির সংযোগ রক্ষা করবে। প্রথম পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত। এছাড়াও, জনমপথ, লতা মঙ্গেশকর চকের কাজও সমাপ্ত হয়েছে।

মন্দির সংলগ্ন মিউজিয়াম / সংগ্রহশালা : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরামর্শে সরযূ নদীর তীরে একটি ৫০ একর জমিতে ভারতীয় মন্দির সমূহের প্রাচীন ইতিহাস তুলে ধরার লক্ষ্যে একটি সংগ্রহশালা নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত।

মেগা ফাউন্টেন পার্ক : ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিক বিনোদন ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি পার্ক, যার মূলকেন্দ্রে থাকবে ৭টি

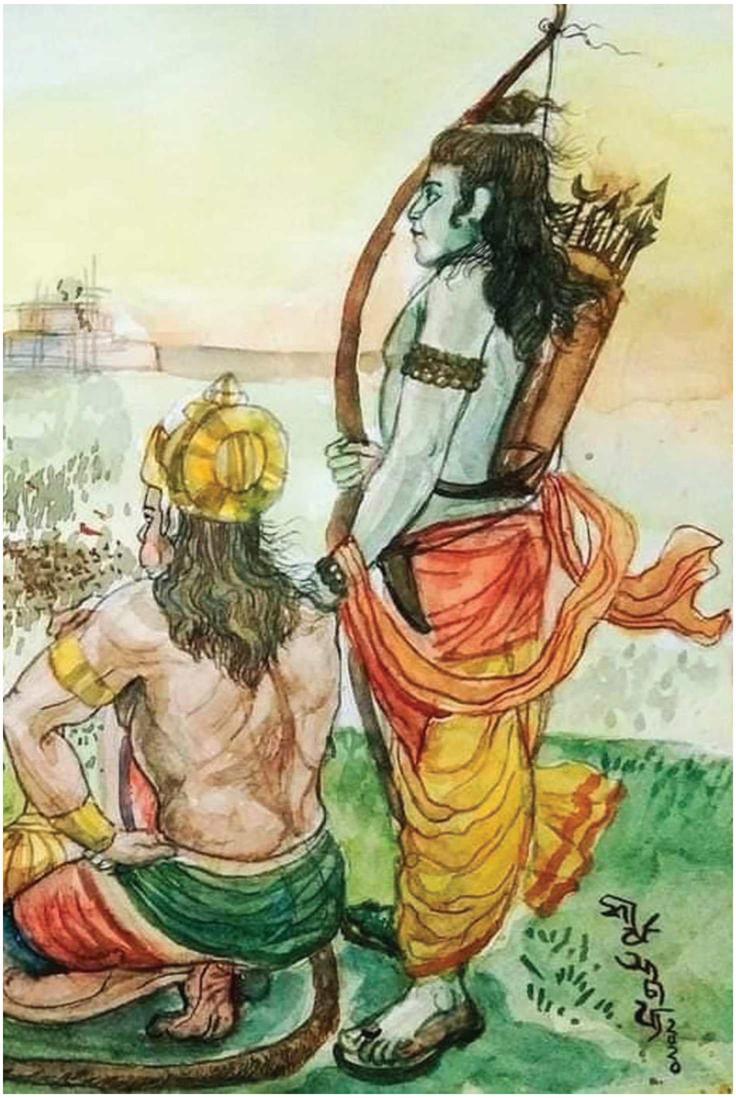

পাপড়িযুক্ত পদ্মফুলের আকৃতির একটি ঝরনা বা ফোয়ারা। ঝরনাটির দলমণ্ডল সপ্ত সিন্ধুর নির্দেশক।

এয়ারো সিটি : ৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এয়ারপোর্ট সংলগ্ন ১৫০ একর জমিতে হোটেল কমপ্লেক্স, বিয়ে বাড়ি ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসার সুবিধাযুক্ত একটি এয়ারো সিটি নির্মাণ।

টেন্ট সিটি : ৬টি টেন্ট সিটি তৈরির লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়েছে যা হতে চলেছে অযোধ্যায় আগত পর্যটকদের আবাসস্থল।

অযোধ্যা হাট : সরযূ নদীর প্রতিটি ঘাটে বর্জ্য পদার্থ শূন্য ফুড কিয়স্ক ও ভেন্ডিং কার্ট স্থাপন।

সন্ধ্যা সরোবর : খোলা আকাশের নীচে একাধিক রেস্তোরাঁ ও ফুড স্টল সমন্বিত ফুড জোন। তার সঙ্গে নৌকাবিহার (বোটিং), জিপলাইনিং, স্ল্যাকলাইনিঙের সুবিধাযুক্ত ৩টি সরোবরের অন্তিম রূপদানের কাজ চলছে।

ওয়াক্স মিউজিয়াম : ২ একর জমিতে রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্র এবং বিখ্যাত ব্যক্তিদের চেহারা আধারিত মোমের পুতুল সমন্বিত একটি ওয়াক্স মিউজিয়ামও নির্মিত হতে চলেছে।

রাম হেরিটেজ ওয়াক : ৯.৬ কোটি টাকা ব্যয়ে রামপথ বরাবর নির্মিত— ১৮০টি দেওয়াল জুড়ে রামায়ণের বিভিন্ন ঘটনাবলী নির্ভর ছবি ও ম্যুরাল সমন্বিত ভাস্কর্য শোভিত একটি হেরিটেজ করিডোর আগামী ৩ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হতে চলেছে।

সূর্য কুণ্ড : ২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে পৌরাণিক গুরুত্ব সম্পন্ন জলাশয়টির সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন। সন্ধ্যাকালীন লেজার লাইট শোয়ের ব্যবস্থা।

পঞ্চবটী দ্বীপ : ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও 'অর্থ গঙ্গা' প্রকল্পের অন্তর্গত, ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপ্রাপ্ত, শুধুমাত্র অস্থায়ী নির্মাণ সম্পন্ন এই মনোরম দ্বীপটি সরযূ নদীবক্ষে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে।

উল্লেখযোগ্য দিনসমূহ :

৯ নভেম্বর, ২০১৯ : একটি ট্রাস্ট গঠন করে শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণের জন্য বিতর্কিত ২.৭৭ একর জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের ৫ জন বিচারপতির বেঞ্চের সর্বসম্মতিক্রমে রায়দান।

৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ১৫ (৯ জন স্থায়ী ও ৬ জন মনোনীত) জন হিন্দু ধর্মাচরণকারী সদস্য বিশিষ্ট— শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট গঠন করা হয়।

৬ ফেব্রুয়ারি : মন্দির নির্মাণের উদ্দেশ্যে ট্রাস্টকে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে প্রতীকী ১ টাকা অনুদান প্রদান।

১৯ ফেব্রুয়ারি : দিল্লিতে অনুষ্ঠিত শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের প্রথম বৈঠকে মোহন্ত নৃত্যগোপাল দাস ট্রাস্টের প্রেসিডেন্ট এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই ট্রাস্টের সম্পাদক (সেক্রেটারি) পদে নির্বাচিত হন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পূর্বতন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি নৃপেন্দ্র মিশ্র মন্দির নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

১৫ মার্চ, ২০২০ : একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁবু থেকে একটি অস্থায়ী মন্দিরে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ কর্তৃক রামলালার স্থানান্তরণ।

৫ আগস্ট, ২০২০ : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কর্তৃক মন্দিরের ভূমি পূজন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মন্দির নির্মাণ কাজের শুভারম্ভ।

১৫ জানুয়ারি, ২০২১ : ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের থেকে প্রথম অনুদানটি সংগ্রহ করে মন্দির নির্মাণের লক্ষ্যে দেশ জুড়ে শ্রীরামজন্মভূমি নিধি সংগ্রহ কার্যক্রমের সূত্রপাত। ট্রাস্টের তরফে প্রায় ৩,৫০০ কোটি টাকা অনুদান সংগৃহীত হয়।

১ জুন, ২০২২ : উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক মন্দিরের গর্ভগৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

২৫ অক্টোবর, ২০২৩ : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তরফে ২২ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে ভব্য মন্দিরে রামলালার অভিষেক ক্রিয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিতি ও নেতৃত্বদানে সম্মতি।

২২ জানুয়ারি, ২০২৪ : অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমিতে নবনির্মিত রামমন্দিরে আরাধ্য রাম (মা কৌশল্যার কোলে শিশু রাম) বা রামলালার অভিষেক পর্ব।

২৭ জানুয়ারি, ২০২৪ : ভক্তবৃন্দ ও সকল দর্শনার্থীদের জন্য মন্দির হবে উন্মুক্ত।

ডিসেম্বর, ২০২৪ : মন্দির নির্মাণের দ্বিতীয় পর্যায় (অর্থাৎ মূল মন্দিরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তল নির্মাণ)-এর পরিসমাপ্তি।

ডিসেম্বর, ২০২৫ : মন্দির নির্মাণের তৃতীয় তথা অন্তিম পর্যায়ে অন্য ৭টি মন্দির ছাড়াও, মন্দির প্রাঙ্গণের চারটি কোণে সূর্যদেব, ভগবান শিব, শ্রীগণপতি ও দেবী ভগবতীর মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং মন্দিরের বহিঃপ্রাচীর নির্মাণ সমাপ্ত হবে। □

ভব্য মন্দিরে শ্রীরামলালা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছেন

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ

পাঁচশো বছরের নিরন্তর প্রতিরোধ এবং ৭৬ বার সংঘর্ষের পরে আগামী ২২ জানুয়ারি, শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থানে ভব্যমন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হতে চলেছে। নতুন মন্দির, নতুন বিগ্রহ, তাই প্রাণপ্রতিষ্ঠা কার্যক্রম। বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে দেশ বিদেশের বিভিন্ন মত-পথ-পন্থ-সম্প্রদায়ের প্রায় ৫ হাজার সাধুসন্ত এবং ৬ হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তি (সরকারি পদাধিকারী এবং বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি) উপস্থিত থাকবেন। প্রধানমন্ত্রীর করকমলে গর্ভগৃহে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে। অনুষ্ঠান চলবে ১৫ জানুয়ারি থেকে ২২ জানুয়ারি দুপুর পর্যন্ত। ২২ জানুয়ারির পর থেকে সাধারণ ভক্তেরা রামমন্দিরের বিগ্রহ দর্শন করতে পারবেন।

বহু আকাঙ্ক্ষিত, বহু প্রতীক্ষিত ভগবান শ্রীরামলালার জন্মস্থানে ভগবানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা, যা এক সময়ে অসম্ভব ছিল, তা এখন সম্ভব হতে চলেছে। এই অভূতপূর্ব ঘটনার সাক্ষী আমরা হতে চলেছি। এই ঘটনা আমরা কেউ প্রত্যক্ষ ও কেউ অপ্রত্যক্ষভাবে দর্শন করব। একসময় যাঁরা অযোধ্যা আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন, যেমন অশোক সিঙ্ঘলজী, দেওরাহা বাবা, রামচন্দ্র পরমহংস দাস, মহন্ত অবৈদ্যনাথজী, হাজার হাজার রামভক্ত করসেবকদের সঙ্গে এই রাজ্যের রামকুমার, শরদকুমার কোঠারী আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তারা হয়তো স্বর্গ থেকে এই দুর্লভ দৃশ্য দর্শন করবেন। সমাজের পিছিয়ে পড়া কৃষক, শ্রমিক, জনজাতি, বনবাসী, গিরিবাসী আজ এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তারাও এই দৃশ্য দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন না।

শ্রীরাম শুভ ও মঙ্গলময়। শ্রীরাম প্রেরণাপুরুষ, শ্রীরাম বিশ্বাসের প্রতীক। তিনি স্বয়ং ধর্ম। রামজন্মভূমি মন্দির রাষ্ট্রীয় একতার প্রতীক। রাজা রাম তখনই মর্যাদা পুরুষোত্তম হয়েছিলেন, যখন তিনি রাজসিংহাসন ছেড়ে বনবাসী হয়েছিলেন, যখন তিনি শবরীমাতার এঁটো কুল খেয়েছিলেন, গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করেছিলেন, নল-নীল-জাম্বুবান আদি বনবাসীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও সীতাহরণের পর তাঁর সকল সহযোগীদের বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়ে টিমওয়ার্ক তৈরি করেছিলেন। রাবণবধের পর সোনার লঙ্কা নিজে দখল না করে বিভীষণকে রাজা করে তিনি জন্মভূমিতে ফিরে আসেন। ১৪ বছর বনবাসের পর অযোধ্যায় ফিরে সরযূ নদীতে স্নান করে বল্কল পরিত্যাগ করে, বেশভূষা পরিত্যাগ করে যখন ভগবান রামচন্দ্র রাজপ্রাসাদে ফিরে আসেন তখন অযোধ্যাবাসীরা অকাল দীপাবলি পালন করেছেন। আজ ৫০০ বছর পরে শ্রীরামচন্দ্র নিজের জন্মস্থানে, নতুন মন্দিরে বিরাজমান হতে চলেছেন। এই আনন্দঘন মুহূর্তে ১২৫ কোটি ভারতবাসীর কী করা উচিত?

কোভিডকালে ভারতের ৫ লক্ষ গ্রাম থেকে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রের নামে ধন সংগ্রহ করে ব্যাংকের মাধ্যমে প্রেরণ করেছিলেন। সেই অর্থেই শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির ও মন্দির পরিসরের কাজ চলছে। মন্দিরে মোট ৫টি মণ্ডপ। (১) নৃত্যমণ্ডপ, (২) রঙ্গমণ্ডপ, (৩) সভামণ্ডপ, (৪) প্রার্থনা মণ্ডপ ও (৫) কীর্তন মণ্ডপ। ত্রিতলবিশিষ্ট এই মন্দিরের উচ্চতা হবে ১৬১ ফুট। গর্ভগৃহে থাকবে ভগবান শ্রীরামলালার বাল্যরূপের বিগ্রহ। অযোধ্যার রামমন্দির হবে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক।

আগামী পৌষ শুক্লা দ্বাদশীর শুভ মুহূর্তে শ্রীরাম জন্মভূমিতে নির্মীয়মাণ নতুন মন্দিরের গর্ভগৃহে ভগবান শ্রীরামলালার বাল্যরূপের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে। এতে সকল ভারতবাসীর হৃদয়ে আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এই উপলক্ষ্যে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রামে মন্দির কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান আয়োজন করবার জন্য রামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রের পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়েছে। প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিন সূর্যাস্তের পরে নিজ নিজ বাসভবনের সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে আলোর উৎসব পালন করতে হবে।

জন্মভূমিতে ভব্য মন্দির সকলের জন্য খুলে দেওয়া হলে সারা দেশ থেকে হাজার হাজার লোককে অযোধ্যায় রামমন্দির দর্শনের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে। ৫ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৫০০০ জনকে অযোধ্যায় নিয়ে যাওয়া হবে। রামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রের পক্ষ থেকে আগামী ১ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত দেশজুড়ে গৃহসম্পর্ক চলছে। এই সম্পর্ক অভিযানকে সফল করার জন্য বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে রামজন্মভূমির পূজিত অক্ষত (চাল) রামমন্দিরের চিত্র এবং আমন্ত্রণপত্র নিয়ে কার্যকর্তারা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে অবগত করাতে। মার্চ মাসের পর যে কোনো সময় সপরিবারে সুবিধামতো সময়ে শ্রীরামের কৃপালাভ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন কর্তৃপক্ষ। এই অভিযানে দেশজুড়ে ৫ লক্ষ গ্রাম এবং ১২ কোটি পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক করা হবে।

অযোধ্যার ভব্য রামমন্দির নির্মাণের জন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বিভিন্ন ধরনের জনজাগরণমুখী কার্যক্রম নিয়েছিল। যেমন রামজানকী রথ পরিক্রমা, রামশিলা পূজন, রাম জ্যোতি রথ, রাম পাদুকা পূজন, ১৩ কোটি রামনাম জপযজ্ঞ অনুষ্ঠান, হনুমৎ শক্তি জাগরণ ইত্যাদি। ভারতবর্ষের জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের প্রেরণা জাগ্রত করবার জন্য সঙ্ঘ বিচার পরিবার কাজ করে চলেছে। □

ধর্মের চরম লক্ষ্য মুক্তি; স্বামী বিবেকানন্দই সে পথ দেখিয়েছেন

মণীন্দ্রনাথ সাহা

১২ জানুয়ারি ভারতের বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব দিন। এই দিনটি ভারতের জাতীয় যুব দিবস হিসেবে পালিত হয়। আক্ষরিক অর্থেই স্বামীজী চির তারুণ্যের প্রতীক, যুব আইকন। যুবসমাজকে প্রেরণা দিতে স্বামীজীর প্রাসঙ্গিকতা চিরায়ত।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগোর বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলনের বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বারবার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে হতাশায় মগ্ন করিয়াছে। এই সকল ভীষণ পিশাচগুলি যদি না থাকিত তাহা হইলে মানবসমাজ আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইত।'

ক্রান্তদর্শী স্বামীজীর কথার সত্যতা ২০০১-এর ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে ইসলামি সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের মধ্য দিয়ে আবারও প্রমাণিত হয়েছে। নাইন-ইলেভেন এভাবে যেন বিশ্বব্যবস্থার চরম ভাবসত্যকে তুলে ধরেছে। ১৮৯৪ সালের ইংল্যান্ডের 'সানডে টাইমস' পত্রিকায় স্বামীজী একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'ভারতে যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর অত্যাচারিত মানুষ আশ্রয় চেয়েছে, ভারত তাদের আশ্রয় দিয়েছে। ব্যতিক্রম, ইসলামি আক্রমণ।'

স্বামীজী আরও বলেছেন— ''অতীতের গর্ভেই ভবিষ্যতের জন্ম। অতএব যতদূর পারো, অতীতের দিকে তাকাও, পিছনে অনন্ত নির্ঝরিণী প্রবাহিত, প্রাণভরে আকণ্ঠ তার জলপান করো, তারপর সম্মুখ প্রসারিত দৃষ্টি নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হও এবং ভারত প্রাচীনকালে যত উঁচু গৌরবশিখরে আরূঢ় ছিল, তাকে তার চেয়েও আরও উঁচু, উজ্জ্বল, মহৎ ও মহিমান্বিত করবার চেষ্টা করো।

তোমরা সহস্র সহস্র সমিতি গঠন করিতে পারো, বিশ হাজার রাজনৈতিক সম্মেলন করিতে পারো, পঞ্চাশ হাজার শিক্ষালয় স্থাপন করিতে পারো, এসবে কিছুই ফল হইবে না, যতদিন না তোমাদের ভিতর সেই সহানুভূতি, সেই প্রেম আসিতেছে— সে হৃদয় সকলের জন্যে ভাবে।

যতদিন না তোমরা সেই এক ভগবানকে এককভাবে সর্বত্র অবস্থিত দেখিতেছ, ততদিন তোমাদের ভিতর সেই প্রেম জন্মিতে

পারে না, সেই প্রেমের পতাকা উড়াইয়া দাও। ওঠো, জাগো, যতদিন না লক্ষ্যে পৌঁছিতেছ, ততদিন নিশ্চিন্ত থাকিও না; ওঠো আর একবার ওঠো, ত্যাগ ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। অন্যকে যদি সাহায্য করিতে চাও, তবে তোমার নিজের অহংকে বিসর্জন দিতে হইবে।"

তিনি আরও বলেছেন— 'সকল উপাসনার সার হলো শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণ সাধন করা। দরিদ্র দুর্বল, রোগী— সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন। আর যে ব্যক্তি কেবল প্রতিমার মধ্যে শিব উপাসনা করে, সে প্রবর্তক মাত্র। যে ব্যক্তি কেবল মন্দিরেই শিবদর্শন করে, তাহার অপেক্ষা যে ব্যক্তি জাতিধর্মনির্বিশেষে একটি দরিদ্রকেও শিববোধে সেবা করে, তাহার প্রতি শিব অধিকতর প্রসন্ন হন।'

অতি শৈশব অবস্থা হইতেই তোমাদের সন্তানরা তেজস্বী হউক। তাহাদিগকে কোনোরূপ দুর্বলতা, কোনোরূপ বাহ্য অনুষ্ঠানে শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই। তাহারা তেজস্বী হউক, নিজের পায়ে নিজেরা দাঁড়াক, সাহসী সর্বজয়ী সবংসহ হউক। সর্ব প্রথমে তাহারা আত্মার মহিমা সম্বন্ধে জানুক।

হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তিনি বলেছেন— '...হিন্দুধর্মে বিগ্রহপূজা যে সকলের অবশ্য কর্তব্য তাহা নয়। কিন্তু কেহ যদি বিগ্রহের সাহায্যে সহজে নিজের দিব্যভাব উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে কি তাহাকে পাপ বলা সঙ্গত? সাধক যখন ওই অবস্থা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, তখনও তাঁহার পক্ষে উহাকে ভুল বলা সঙ্গত নয়। হিন্দুর দৃষ্টিতে মানুষ ভ্রম হইতে সত্যে গমন করে না, পরন্তু সত্য হইতে সত্যে— নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে উপনীত হইতেছে।... হিন্দুদের অবশ্যই অনেক দোষ আছে; কিন্তু এইটি জানা উচিত যে, ইহা তাঁহাদের আত্মদেহপীড়নেই আবদ্ধ, অন্য ধর্মাবলম্বীদের শিরশ্ছেদনে বিস্তৃত নয়। হিন্দু নর-নারীর মধ্যে কেহ কেহ ধর্মোন্মাদ হইয়া অগ্নিকুণ্ডে স্বীয় দেহপাত করেন না; এবং যদিও ইহাকে তাঁহাদের দুর্বলতা বলো, সে দোষ হিন্দুধর্মের নয়। খ্রিস্টানরা ডাইনি বলিয়া যে কত শত নারীকে পোড়াইয়া মারিয়াছে, তাহা কি খ্রিস্টধর্মের দোষ, না তাদের নিজেদের দোষ?..

আমি ধর্মকে শিক্ষার ভিতরের সার জিনিস বলিয়া মনে করি। এটি কিন্তু মনে রাখিবেন যে, আমি আমার নিজের বা অপর কাহারও ধর্ম সম্বন্ধে মতামতকে 'ধর্ম' বলিতেছি না। যে ভাবধারা পশুকে মানুষে এবং মানুষকে দেবতায় পরিণত করে, তাহাই ধর্ম। ধর্ম ও ঈশ্বর বলিতে অনন্ত শক্তি, অনন্ত বীর্য বুঝায়। অবকাশ ও উপযুক্ত দেশকাল পেলেই সেই শক্তির বিকাশ হয়। কিন্তু বিকাশ হোক বা না হোক, সে শক্তি প্রত্যেক জীবে বর্তমান আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত। মন্দির ও গির্জা, শাস্ত্র ও অনুষ্ঠান, এগুলি কেবল ধর্মের শিশুশিক্ষামাত্র, যাহাতে প্রবর্তক, প্রাথমিক সাধক শক্ত সবল হইয়া ধর্মের উচ্চতর সোপান অবলম্বন করিতে পারে।

তিনি আরও বলেছেন, '...অভিজ্ঞতাই আমাদের একমাত্র শিক্ষা। আমরা সারাজীবন তর্কবিচার করিতে পারি, কিন্তু নিজেরা প্রত্যক্ষ অনুভব না করিলে সত্যের কণামাত্র বুঝিতে পারিব না। কয়েকদিন পুস্তক পড়িতে দিয়া তুমি কোনও ব্যক্তিকে অস্ত্রচিকিৎসক করিয়া তুলিবার আশা করিতে পার না। একখানি মানচিত্র দেখাইয়া আমার দেশ দেখিবার কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পার না। আমাকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হইবে। মানচিত্র কেবল অধিকতর জ্ঞানলাভের আগ্রহ জন্মাইয়া দিতে পারে। ইহা ব্যতীত উহার আর কোনো মূল্য নাই।'

অসুস্থ শরীরে ধর্মপালন করা যায় না। ধর্মপালন করতে গেলে শরীরকে যে সুস্থ রাখতে হবে, সেজন্য তিনি বলেছেন, 'আমি তোমাদের স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি, আমরা দুর্বল, অতি দুর্বল। প্রথমত আমাদের শারীরিক দৌর্বল্য— এই শারীরিক দৌর্বল্য আমাদের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ দুঃখের কারণ। আমরা অলস, আমরা কাজ করিতে পারি না; আমরা একসঙ্গে মিলিতে পারি না; আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি না; আমরা ঘোর স্বার্থপর; আমরা তিনজন একসঙ্গে মিলিলেই পরস্পরকে ঘৃণা করিয়া থাকি, ঈর্ষা করিয়া থাকি। আমাদের এখন এই অবস্থা— আমরা অতিশয় বিশৃঙ্খল ভাবাপন্ন, ঘোর স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছি...।

...আমরা চাই নির্ভীক সাহসী লোক, আমরা চাই রক্ত তাজা হউক, স্নায়ু সতেজ হউক, পেশি লৌহদৃঢ় হউক। মস্তিষ্ককে দুর্বল করে এমন ভাব দরকার নাই। সেগুলি পরিত্যাগ করো। সর্বপ্রকার রহস্যের দিকে ঝোঁক ত্যাগ কর। কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া সবল হও। হে বীরহৃদয় যুবকবৃন্দ আর কিছুরই আবশ্যক নেই, আবশ্যক শুধু প্রেম, সরলতা ও সহিষ্ণুতা।

ধর্মের চরম লক্ষ্য মুক্তি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'ধর্ম হলো সেটাই, যা পশুকে মানুষে এবং মানুষকে দেবতায় পরিণত করে।' এর অর্থ হলো, ধর্ম হলো একটি বিকাশের প্রক্রিয়া। পাশবিক মানুষের আনন্দ শুধু শরীরগত। শরীরের সুখ বা ইন্দ্রিয়চরিতার্থ ছাড়া সে আর কিছুই বোঝে না। আর একটু উন্নত হলে মানুষ মানসিক আনন্দলাভের অধিকারী হয়, তখন সে সাহিত্যের রস, শিল্পের রস অনুভব করতে পারে। এটাকে মানবীয় স্তর বলা হয়। আরও উন্নত অবস্থায় মানুষ ঈশ্বরীয় আনন্দে বিভোর হয়, ধ্যানাবস্থায় শান্তির অপূর্ব পরিবেশ অনুভব করতে পারে, যাকে বলা যায় দৈবী স্তর।

এভাবে উন্নত হতে হতে মানুষ যখন দেহ, মন, ইন্দ্রিয়ের গণ্ডি অতিক্রম করে, তখনই সে লাভ করে শ্বাশত জ্ঞান বা সনাতন সত্য। সে অনুভব করে সে ক্ষুদ্র নয়, সে দেহ নয়, মন নয় এমনকী চিন্তা চেতনাও নয়, সে আত্মা। সে এক অনন্ত, অখণ্ড অস্তিত্ব।

মানুষ তখন তার ক্ষুদ্রতার খোলস পরিত্যাগ করে অনন্তে লীন হয়ে যায়। সিংহ যেমন পিঞ্জর ভেঙে ফেলে বেরিয়ে যায় ঠিক তেমনি সে এই জগৎজাল ভেদ করে মুক্ত হয়ে যায়।

ধর্মের চরম লক্ষ্য হলো মুক্তি। ধর্ম হলো এই রূপান্তরের প্রক্রিয়া, যা পশুকে মানুষে, মানুষকে দেবতায় এবং দেবতাকে ঈশ্বরে বিকশিত করে। ঋষিদের আবিষ্কৃত এই সত্যলাভের পথই সনাতন ধর্ম। □

শিল্পী অরুণ যোগীরাজ নির্মিত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে অযোধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভাস্কর অরুণ যোগীরাজের শিল্পকর্ম ও শিল্পসুষমা সত্যিই অসাধারণ। তিনি যেন সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের আশীর্বাদধন্য। এর আগে তাঁর নির্মিত নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মূর্তি দিল্লিতে কর্তব্য পথে স্থাপিত হয়। কেদারনাথে প্রতিষ্ঠিত আদি শঙ্করাচার্যের মূর্তিটিও তাঁরই হাতে তৈরি। আগামী ২২ জানুয়ারি শ্রীরামজন্মভূমি অযোধ্যায় নির্মিত ভব্য রামমন্দিরে হতে চলেছে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা। শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ নবনির্মিত রামমন্দিরে প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর নির্মিত বিগ্রহটিকেই নির্বাচিত করেছেন যার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কিছুদিন পরেই হতে চলেছে।

মহীশূর নিবাসী ভাস্কর অরুণ যোগীরাজ নির্মিত রামলালার বিগ্রহটির নির্বাচনের বিষয়টি উল্লেখ করে গত ১ জানুয়ারি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'যেখানে ভগবান শ্রীরাম বিরাজ করেন, সেখানেই শ্রীহনুমানের বাস। অযোধ্যায় ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য বিগ্রহের নির্বাচনও চূড়ান্ত। তিনি ভারতের প্রখ্যাত শিল্পী, অরুণ যোগীরাজ, যাঁর জন্য আমরা আজ গর্বিত'। এর আগে এই সংবাদটি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে প্রথম পোস্ট করে কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা বি.এস. ইয়েদুরাপ্পা মহীশূর রাজপ্রাসাদের শিল্পী ঘরানার অন্তর্গত পরিবার থেকে উঠে আসা ভাস্কর অরুণ যোগীরাজকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। অযোধ্যায় রামমন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসবের সম্পূর্ণ নির্ঘণ্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

১৬ জানুয়ারি, ২০২৪ : সরযূ নদীর তীরে দশবিধ স্নান

১৭ জানুয়ারি, ২০২৪ : রামলালাকে নিয়ে শোভাযাত্রা

১৮ জানুয়ারি, ২০২৪ : গণেশ অম্বিকা পূজা, বাস্তু পূজা

১৯ জানুয়ারি, ২০২৪ : অগ্নিস্থাপন, যজ্ঞ

২০ জানুয়ারি, ২০২৪ : মন্দিরের গর্ভগৃহ ধৌত

২১ জানুয়ারি, ২০২৪ : রামলালার স্নান

২২ জানুয়ারি, ২০২৪ : রামলালার প্রতিষ্ঠা

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজমুদ্রা অনুসরণে প্রস্তুত ভারতীয় নৌসেনা অ্যাডমিরালদের এপোলেট

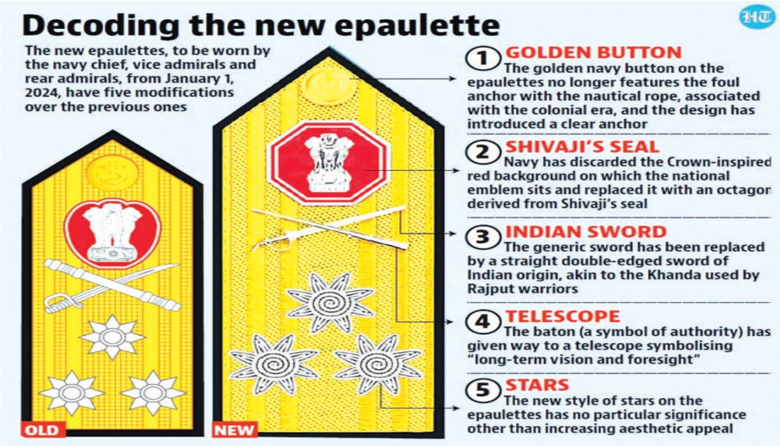

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৪ ডিসেম্বর, ২০২৩, নেভি ডে বা নৌসেনা দিবসে ভারতীয় নৌসেনার তরফে সামনে এল শীর্ষ নৌসেনা আধিকারিক বা অ্যাডমিরালদের স্কন্ধোপরিস্থ চিহ্ন বা এপোলেটের নতুন ডিজাইন। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ প্রবর্তিত রাজমুদ্রার চিহ্নের অনুসরণে এই নতুন এপোলেটের ডিজাইনটি করা হয়েছে। রেয়ার অ্যাডমিরাল, সার্জেন রেয়ার অ্যাডমিরাল, অ্যাডমিরাল, ভাইস অ্যাডমিরাল ও সার্জেন ভাইস অ্যাডমিরালদের সামরিক পরিচ্ছদে ব্যবহৃত নতুন এই এপোলেটগুলি হতে চলেছে ভারতীয় নৌবাহিনীর অতীত ঐতিহ্যের পরিচায়ক। গোল্ডেন নেভি বাটন, অষ্টভুজাকৃতি অক্টাগন, তরবারি বা সোর্ড ও একটি টেলিস্কোপ সমন্বিত নতুন ডিজাইনের এই এপোলেটগুলি ভারতীয় নৌবাহিনীর মূল চিন্তাধারা, সামরিক আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী, বাহিনীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং চির-বিবর্তিত এই বিশ্ব প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে নৌবাহিনীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সার্থক প্রতিফলন। গত ৪ ডিসেম্বর সিন্ধুদুর্গে উদ্‌যাপিত নৌসেনা দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর বক্তব্যে এই ডিজাইনটির উল্লেখ করে ভারতীয় নৌবাহিনীর এই চিহ্ন ও অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয়টি বিশদ ভাবে তুলে ধরেন।

জম্মু-কাশ্মীরে মুসলিম লিগ ও তেহরিক-ই-হুরিয়তকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৩-এ জম্মু-কাশ্মীর মুসলিম লিগকে নিষিদ্ধ সংগঠন বলে ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার। এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এরপর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, মুসলিম লিগ জম্মু-কাশ্মীর জঙ্গিদের মদত দেওয়ার মতো রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত, তাই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এক সময় মুসলিম লিগ জম্মু-কাশ্মীরের নেতৃত্ব দিত বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানি। বর্তমানে সংগঠনের নেতৃত্বে রয়েছে অল ইন্ডিয়া হুরিয়ত কনফারেন্সের কট্টরপন্থী গোষ্ঠীর অন্তর্বর্তী চেয়ারম্যান মাসারাত আলম। সেই সংগঠনকেই এবার নিষিদ্ধ ঘোষণা করল কেন্দ্র। সংগঠন ও সংগঠনের সদস্যরা জম্মু-কাশ্মীরের দেশবিরোধী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত এবং জঙ্গি কার্যকলাপকে সমর্থন করে স্থানীয় জনতাকে জম্মু-কাশ্মীরে ইসলামিক শাসন প্রতিষ্ঠায় প্ররোচিত করেছে বলে জানিয়েছেন অমিত শা।

তিনি লিখেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের স্পষ্ট বার্তা হলো--- যে আমাদের জাতির ঐক্য, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার বিরুদ্ধে কাজ করবে তাকে রেহাই দেওয়া হবে না। কঠিন আইনের মুখোমুখি তাদের হতে হবে।'

অন্যদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নোটিশে বলা হয়েছে, সংগঠনটি ভারত বিরোধী ও পাকিস্তানের পক্ষে প্রচার চালাতো। সংগঠনের নেতারা বেআইনি কার্যকলাপের জন্য পাকিস্তানপন্থী সংস্থার থেকে তহবিল সংগ্রহ করত। কেন্দ্রের বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, এই সংগঠনের (এমএলজেকে-এম) নেতারা, বিশেষ করে চেয়ারম্যান মাসারাত আলম দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা, নিরাপত্তা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে ক্ষতিকর কর্মকাণ্ডে লিপ্ত। এই কারণেই সংগঠনটিকে বেআইনি ঘোষণা করা হলো।

এরপর গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩-এ 'আনলফুল অ্যাক্টিভিটিজ (প্রিভেনশন) অ্যাক্ট' বা ইউএপিএ আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে একদা বিচ্ছিন্নতাবাদী কাশ্মীরি নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানির নেতৃত্বে পরিচালিত তেহরিক-ই-হুরিয়তকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শা জানিয়েছেন যে এই সংগঠনটি জম্মু-কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে সেখানে ইসলামিক শাসন বলবৎ করার কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই দলটি ভারত-বিরোধী প্রচার ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মাধ্যমে জম্মু-কাশ্মীর জুড়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মকাণ্ডেও সক্রিয় ছিল। এক্স হ্যান্ডেলে অমিত শা লেখেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বারা গৃহীত জিরো-টলারেন্স নীতি অনুযায়ী ভারত-বিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত যে কোনো ব্যক্তি, দল বা সংগঠনের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া চলবে'।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম- ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা